ধৃতং প্রেম্না

অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর

শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেব

ত্রয়োবিংশ খণ্ড

ওঁ

ধৃতং প্রেম্না

ত্রয়োবিংশ খণ্ড

অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর

শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেব প্রণীত

দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৪১৫
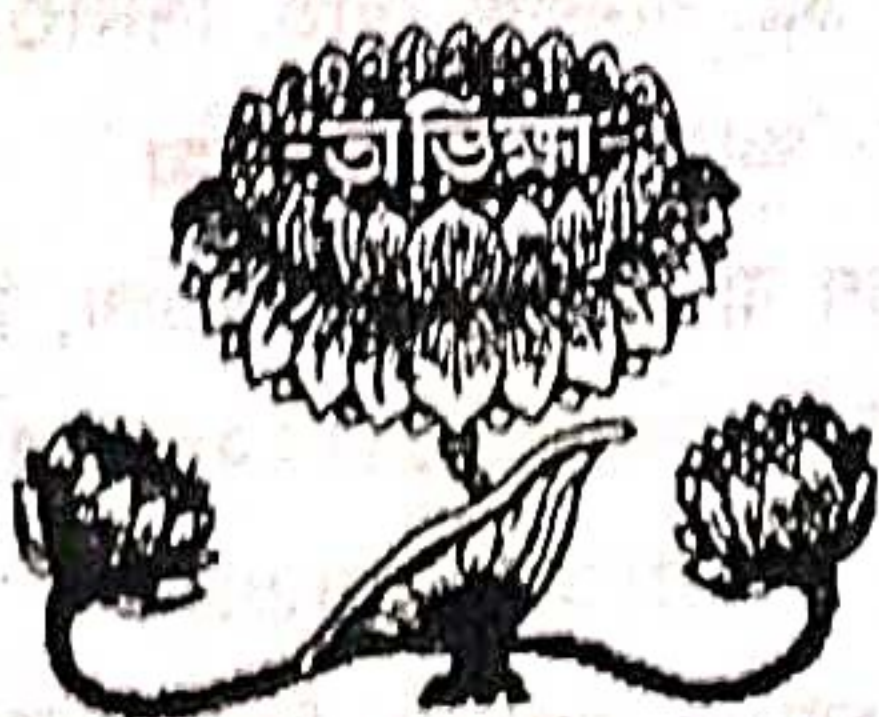
—নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ—

—ভিক্ষায়াং নৈব নৈব চ—

অযাচক আশ্রম

ডি ৪৬/১৯ বি, স্বরূপানন্দ ষ্ট্রীট, বারাণসী-১০

ল্য ঃ ত্রিশ টাকা (মাশুল স্বতন্ত্র)

ত্রয়োবিংশ খণ্ডের নিবেদন

অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেবের সমসাময়িক পত্রাবলি (যাহা ১৩৬৫ হইতে ১৩৭২-৭৩ সালের "প্রতিধ্বনিতে"তে ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হইয়াছে) তাহাই সঙ্গে সঙ্গে পুস্তকাকারেও প্রচারিত হইয়াছে। ইহা তাহার ত্রয়োবিংশ খণ্ড। কাজের প্রয়োজনে একই পত্রের অনুলিপি করিবার শ্রম বাঁচাইবার জন্য এই সকল পত্র "প্রতিধ্বনি"তে প্রকাশিত হইয়াছিল। "প্রতিধ্বনি"তে প্রকাশের পরে দেখা গেল, এই পত্রগুলি সর্বসাধারণের পক্ষেও সুলভ্য করা আবশ্যক। সেই কারণেই "ধৃতং প্রেম্না" পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইল। আমরা অতীব আনন্দের সহিত জানাইতেছি যে, "ধৃতং প্রেম্না" প্রথম হইতে দ্বাবিংশ খণ্ড প্রকাশিত হইবার পর জনসাধারণের মধ্য হইতে বহু সজ্জন ব্যক্তি পত্রগুলির উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিয়া পত্র দিয়াছেন। তাঁহারা লিখিয়াছেন যে, পত্রগুলি পাঠ করিয়া জীবনের বহু সমস্যার সমাধান তাঁহারা পাইতেছেন। তাই আজ আনন্দভরা প্রাণ নিয়া "ধৃতং প্রেম্না" ত্রয়োবিংশ খণ্ড প্রকাশিত হইতে চলিল। নিবেদনমিতি—আষাঢ়, ১৩৭৩ বাংলা।

অযাচক আশ্রম
স্বরূপানন্দ ষ্ট্রীট,
বারাণসী-১০

বিনীত
ব্রহ্মচারিণী সাধনা দেবী
ব্রহ্মচারী স্নেহময়

এই দ্বিতীয় সংস্করণ প্রথম সংস্করণের হুবহু পুনর্মুদ্রণ।

প্রকাশক

মুদ্রণ-সংখ্যা ২,০০০ (দুই হাজার)

প্রকাশক—শ্রীস্নেহময় ব্রহ্মচারী
অযাচক আশ্রম
ডি ৪৬/১৯ বি, স্বরূপানন্দ ষ্ট্রীট, রামাপুরা,
বারাণসী-২২১০১০, দূরভাষ : (০৫৪২) ২৪৫২৩৭৬

প্রিন্টার :—শ্রীস্নেহময় ব্রহ্মচারী,
অযাচক আশ্রম প্রিন্টিং ওয়ার্কস,
ডি ৪৬/১৯এ, স্বরূপানন্দ ষ্ট্রীট, বারাণসী

: পুস্তকসমূহের প্রাপ্তিস্থান :

অযাচক আশ্রম
ডি ৪৬/১৯ বি, স্বরূপানন্দ ষ্ট্রীট, বারাণসী-২২১০১০ (উত্তর প্রদেশ)

গুরুধাম
পি-২৩৮, সি-আই-টি রোড, কাঁকুড়গাছি,
কলকাতা-৭০০০৫৪ ● দূরভাষ-২৩২০-৮৪৫৫

অযাচক আশ্রম
"নগেশ ভবন", ৯৯, রামকৃষ্ণ রোড, শিলিগুড়ি, দার্জ্জিলিং

অযাচক আশ্রম
২০বি, লক্ষ্মীনারায়ণ বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা (পশ্চিম)
দূরভাষ : (০৩৮১)২২২৮৩০৫

অযাচক আশ্রম
পোঃ চন্দ্রপুর, ধর্মনগর, ত্রিপুরা (উত্তর)

অযাচক আশ্রম
রাধামাধব রোড, শিলচর-৭৮৮০০১, দূরভাষ : (০৩৮৪২) ২২০৩৩৩
"সাধন কুঞ্জ" : হীরাপুর, ধানবাদ, ঝাড়খণ্ড ● দূরভাষ-০৩২৬ ২২০০২২৮

দি মাল্টিভার্সিটি
পোঃ—পুনদী আশ্রম, জেলা—বোকারো, ঝাড়খণ্ড, পিনকোড : ৮২৭০১৩

ডাকে নিতে হইলে ২৫% অগ্রিম মূল্যসহ বারাণসীতেই পত্র দিবেন।

অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর

ওঁ
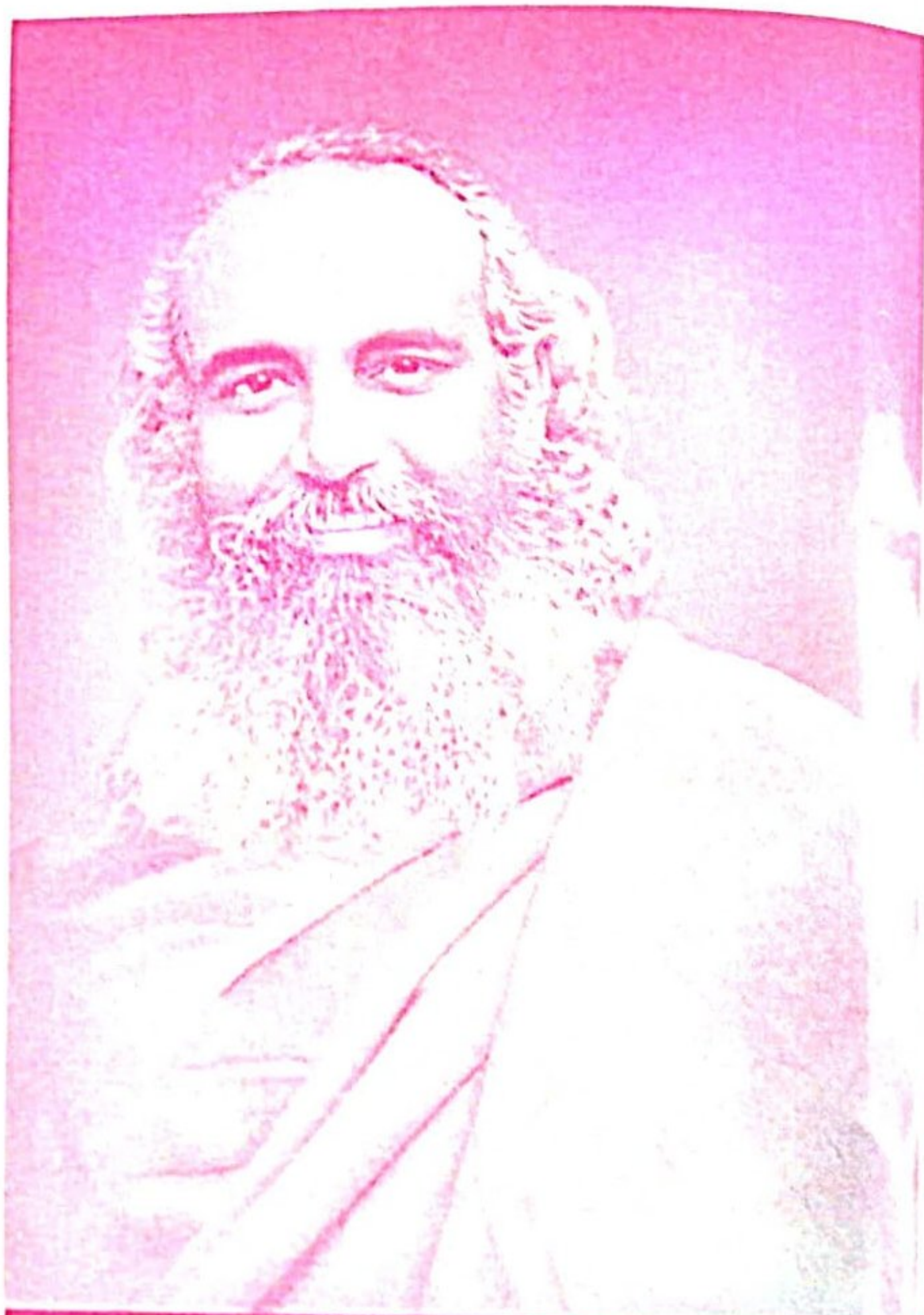
ধৃতং প্রেম্না

(ত্রয়োবিংশ খণ্ড)

—*—

(১)

হরি-ওঁ

১২ই অগ্রহায়ণ,
রবিবার, ১৩৭২
২৮-১১-৬৫ ইং

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তোমার ভিতরে ব্যক্তিত্বও আছে, দক্ষতাও আছে। কিন্তু এই মহৎ দুইটী সম্পদকে তুমি এমন ভাবে ব্যবহার করিতে পারিতেছ না, যাহাতে অন্যান্য শতজনের ব্যক্তিত্ব এবং সহস্র জনের দক্ষতা একত্র মিলিত হইয়া একটা মহাযজ্ঞের সূচনা এবং সমাপ্তি ঘটাইতে পারে। পৃথিবীতে অধিকাংশ লোকই অদক্ষ, অপটু। দুই চারিশত লোকের মধ্যে একটী দুইটী দক্ষ লোক পাওয়া যায়। ব্যক্তিত্ব তদপেক্ষাও দুর্লভতর সম্পদ। হাজার দক্ষ ব্যক্তির মধ্যে কদাচিৎ একটী দুইটী ব্যক্তিত্ব-সম্পন্ন লোক দেখা যায়। এই হিসাবে বিচার করিতে গেলে তোমাকে একটী দুর্লভ মানুষ বা পুরুষরত্ন বলিতে হয়।

কিন্তু তুমি তোমার ব্যক্তিত্ব ও যোগ্যতা কি ভাবে ব্যবহার

করিতেছ? চতুর্দ্দিকে যাহারা তোমার নেতৃত্বের প্রত্যাশায় তোমারই মুখপানে তাকাইয়া থাকে, তুমি তাহাদিগকে সংঘবদ্ধ করিয়া একমুখ হইবার আহ্বান জানাইয়াছ কি? ইহাদের মধ্যে যাহারা দুর্ব্বল, তুমি কি তাহাদিগকে ডাকিয়া কহিয়াছ যে, লক্ষ পিপীলিকার শক্তি মিলিত হইলে মত্ত হস্তীকেও জয় করা যায়? তুমি কি তাহাদিগকে কখনও বলিয়াছ যে, নারিকেলের তুচ্ছ তুচ্ছ আঁশ একত্র মিলিত হইয়া রজ্জুবদ্ধ হইলে সমুদ্রের জাহাজ বাঁধিয়া রাখা যায়? তুমি কি তাহাদিগকে বলিয়াছ যে জনপ্রতি একটী করিয়া ছোট মাটির ঢেলা বা কাঁকড় তুলিয়া লইয়া গেলে লক্ষ কোটি দুর্ব্বল নরনারীর মিলনের ফলে পর্ব্বত সরোবরে রূপান্তরিত হইতে পারে? তুমি কি তাহাদের বলিয়াছ যে, অসংখ্য লোকের এক মুষ্টি করিয়া স্নেহদত্ত তণ্ডুল একটা দুর্ভিক্ষ নিবারণ করিয়া দিতে পারে? তুমি কি তাহাদের বলিয়াছ, যুগান্তরব্যাপী কর্ম্ম পরিচালনার সুদৃঢ় সঙ্কল্প লইয়া যদি কয়েক হাজার নরনারী প্রত্যহ শাবল দিয়া মাত্র দুই চারি টুকরা নরম পাথর উপাড়িয়া ফেলিতে থাকে, তাহা হইলে ভারত হইতে পিকিং পর্য্যন্ত রাস্তা দরিদ্রেরাই নির্ম্মাণ করিতে পারে এবং পূর্ব্বকালে একদা যেমন ভারতবর্ষ চীনকে শিক্ষা দিয়াছিল ধর্ম্মের, তেমন করিয়া নূতন ধারায় নবাদর্শে শিষ্যত্ব স্বীকার করাইতে পারে? বহুজনে মিলিলে এবং ধারাবাহিক প্রযত্নে চলিলে ক্ষুদ্রেরাও, তুচ্ছেরাও, নগণ্যেরাও অকল্পনীয় কার্য্য করিতে পারে। আজ আমি নিদারুণ ভগ্ন স্বাস্থ্য লইয়া পুনরায় পুপুন্‌কীতে শ্রম সুরু করিয়াছি। কৈ, তোমাকে ত' দেখিলাম না, তোমার প্রভাবাধীন সমগোত্রীয়দের সঙ্গে মিলিত হইয়া পরামর্শে বসিতে যে, কি করিয়া

এই শ্রমের অংশ তোমরাও লইতে পার? তোমা অপেক্ষা অল্পতর প্রভাবসম্পন্ন অপর কেহ এই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিলে প্রকৃত সংকর্ম্ম সাধনের চেষ্টায় নামিবার ফলে নূতন করিয়া তাহাদের যে প্রভাব সৃষ্ট হইবে, তাহাতে ঈর্ষান্বিত হইয়া নূতন জটিলতা সৃষ্টি করাই কি শেষ পরিণাম দাঁড়াইবে না? একবার একজন নেতা হইলে চিরকালই সে নেতা থাকিতে চাহে, ইহা কিছু অস্বাভাবিক নহে, অন্যায়ও নহে। কিন্তু নেতা থাকিতে হইলে যাহা করিতে হয়, তাহা হইতে নিজেকে দূরে সরাইয়া রাখিয়া কেবল অতীত কৃতিত্বের জয়ধ্বজা উড়াইলে চিরকাল কেহ নেতা হইয়া থাকিতে পারে না। আর, কলে-কৌশলে যদিও বা এই নেতৃত্ব কাহারও থাকিয়া যায়, তাহা হইলে দেশ ও সমাজের মঙ্গলসাধন না করিয়া সে নেতৃত্বের অহমিকায় জাতির সমাধি-শয়ন রচনা করে। এইগুলি ঐতিহাসিক সত্য, কোনও কষ্ট-কল্পনা নহে।

তোমার ব্যক্তিত্ব অযথা সৃষ্ট হয় নাই। তুমি লোকের বহু কল্যাণ-সাধন করিয়াছ, তোমার উদারতা বহু নরনারীর উপকার করিয়াছে। এমন অনেক বাক্য তুমি উচ্চারণ করিয়াছ, যদনুযায়ী কার্য্য করিতে যাইয়া বিপদে পড়িয়াও তুমি বাক্যরক্ষায় কদাচ অবহেলা কর নাই। কিন্তু সেই যোগ্যতা আবহমানকাল কেন তোমাকে দিয়া জনকল্যাণ করাইবে না? এই ব্যাপারে পেন্‌সন-প্রাপ্ত সরকারী কর্ম্মচারীর ন্যায় অবসর লইবার অবকাশ তোমার কোথায়?

তোমার ব্যক্তিগত মর্য্যাদাবোধ সম্পর্কে সচেতন না হইয়া তোমাকে

আমি তোমার প্রকৃত কর্ত্তব্য সম্পর্কে সচেতন হইতে আহ্বান করিতেছি। এই সচেতনতা যদি তোমার আসে, বাহির হইতে দেখিলে তোমাকে মাটির মানুষ মনে হইবে, কিন্তু আসলে হইবে তুমি সোণার মানুষ। তোমাকে আমি তোমার পরিপূর্ণ সার্থকতায় দেখিতে চাহি। অর্দ্ধ-সফল অর্দ্ধ-বিফল নগণ্য জীবন লইয়া পৃথিবীতে বিচরণ করিবে, ইহার কোনও সার্থকতা নাই। একদা তোমার তরুণ কৈশোরে আমার রহিমপুর আশ্রমে অবস্থান-কালে তুমি পরমমঙ্গলময় নামের শরণাপন্ন হইয়াছিলে। সেই নামের সাধন অব্যাহত রাখ। নামের সাধন হইতে দূরে থাকিলে দর্প, দম্ভ, অহঙ্কার এবং লোকের কাছে বাহবা লইবার প্রবৃত্তি মাথা চাড়া দিয়া উঠে। নামের সেবার প্রতাপে উদ্যতফণ ভুজঙ্গের ন্যায় এই সকল শত্রুকে, শ্রীকৃষ্ণ যেমন করিয়া কালিয়দমন করিয়াছিলেন, তেমন করিয়া দমন কর, দলন কর। নিজেকে বৃহত্তর কর্ম্মে এবং মহত্তর সাধনায় যোগ্য করিয়া তুলিবার জন্য সাধন-কর্ম্মে সর্ব্বতোভাবে নিয়োজিত কর। এ জগতে দুর্ব্বলের বিড়ম্বনা-ভোগ কদাচ কমে না। সাধন করিয়া সবল হও। বাহুবলই বল নহে, আস্ফালনও বল নহে, বড় বড় কথা কহিবার শক্তিও বল নহে, কবিত্বও বল নহে, দার্শনিকতাও বল নহে,—ব্রহ্মবলই বল। সেই বলে বলিয়ান্ হও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(২)

হরি-ওঁ

মঙ্গলকুটীর
১২ই অগ্রহায়ণ, ১৩৭২
রাত্রি ৮টা

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

আমরা এখানে মজার মধ্যে আছি। বারাণসী হইতে অনেক দূর দিয়া রাজমিস্ত্রী আনা হইয়াছে। গৃহনির্ম্মাণের কার্য্য বন্ধ রাখিলে ইহারা ভাতে মরে। আর, আমাদের দোষে কার্য্য বন্ধ থাকিলে ইহারা বসিয়া থাকিলেও ইহাদিগকে বেতন অবশ্যই দিতে হয়। এদিকে ধান কাটার মরসুম পড়িয়া গিয়াছে। কুলী-কামিন মিলে না। যাহা মিলে তাহাও হাসুয়া হস্তে ধানের ক্ষেতে পাঠাইয়া দিতে হয়। ধান কাটিতে কাটিতে রাত্র হইয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে ধানগুলি ঘরে তোলা গেল না। পরদিন সকালে দেখা গেল, চোরের পৌষমাস আসিয়া গিয়াছে। এক গোছা ধানও ক্ষেত্রে নাই। এই অবস্থায় আশ্রমের প্রত্যেকটি কর্ম্মী আমরা দুর্ল্লভ্য দুই চারিটী কুলী কামিনের সঙ্গে কেহ ধানক্ষেতে কেহ ইট টানায়, মশলা মিলানোতে, জল টানায় আর গাঁথুনিতে লাগিয়া রহিয়াছে।

কাল শ্রীমান প্রেমানন্দকে আলকুশা পাঠাইয়াছি। আজ পাঠাইলাম তাহাকে গোপালপুরে। কমপক্ষে ত্রিশ চল্লিশ জন চাষী অখণ্ড আশ্রমের ধান কাটিয়া দিবার জন্য আসিবার কথা ছিল। কিন্তু কৃষকদের উপরে সরকারী নোটিশ পড়িয়া গিয়াছে যে, একটা নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ ধান্য প্রত্যেককে সরকারী ভাণ্ডারে জমা দিতে হইবে। এবার বৃষ্টি হয় নাই। ধান-ফসলের অবস্থা খুবই খারাপ। গরীব চাষাদের অধিকাংশেরই

বছরের খোরাক হইবে না। সকলে মাথায় হাত দিয়া বসিয়াছে। সরকারী নোটীশ পাইয়া ঘরে ঘরে হাহাকার আরম্ভ হইয়াছে। কেহ ছুটিয়াছে চাশে ব্লক অফিসে। কেহ ছুটিয়াছে ধানবাদে ডি. সি. অফিসে। আশা, যদি কোনও সুরাহা হয়। নেতারা বিদেশে ভারতের কোটি কোটি মুদ্রা বিলাসে এবং অপব্যয়ে জলাঞ্জলি দিয়া আজ দরিদ্রের কষ্টার্জ্জিত অন্নমুষ্টির উপরে লুব্ধ-দৃষ্টি হইয়াছেন মনে করিয়া ইহারা ভবিষ্যৎ অন্ধকার দেখিতেছে। ফলে ত্রিশ চল্লিশটী লোকের বদলে আলকুশা হইতে মাত্র চারিটী সেবক আসিয়া ধান কাটিয়া দিয়া গেল। আশ্রমের কর্ম্মীরা কেহ ধান মাড়াইতে ব্যস্ত, কেহ গোযান বোঝাই করিয়া ধানের আটিগুলি খামারে আনিতে ব্যস্ত। আমি রাজমিস্ত্রীর সঙ্গীয় কাজ ছাড়িয়া এইমাত্র মঙ্গলকুটীরে আসিয়া বসিলাম। সাধনা একখানা যষ্ঠি হস্তে একখানা মোড়ায় বসিয়া অন্ধকারের ভিতর একাকিনী মাঠের কাটা ধান পাহারা দিতেছে।

এই অবস্থায় তোমরা প্রত্যাশা করিতে পার না যে, তোমাদের প্রতি জনকে আমি একখানা করিয়া পত্র লিখিবার অবসর নিশ্চয়ই পাইব।

তোমাদের শুধু ইহাই বলিতে চাহি যে, সর্ব্বক্ষণ মনে রাখিও, তোমাদের মধ্য দিয়া ভারতে এক নবজাগরণের সৃষ্টি হইতেছে, যাহার ফল বিশ্বজনের কুশল। তোমরা একতা ও একাগ্রতার সাধন কর। কারণ, এই দুইটী জিনিষ না থাকিলে তোমরা কেহই বড় হইতে পারিবে না, বড় কাজও করিতে সমর্থ হইবে না। বহুজনের প্রজ্ঞা, বহুজনের রুচি এবং বহুজনের চেষ্টা একত্র সম্মিলিত হইলে জগতে মহৎ আন্দোলনের উন্মেষ হয় এবং তাহা ভাবজগতে এবং

জাতির ইতিহাসে নব বিপ্লবের সূচনা করে। অপরিচ্ছন্ন কদর্য্য এই জগৎকে তোমরা ভাঙ্গিয়া চূরিয়া নূতন করিয়া গড়িবে, এই সঙ্কল্পে সমারূঢ় হও।

জগতে যখন নব ভাবের উন্মেষ হয়, তখন শিল্পে, সাহিত্যে, সঙ্গীতে, নাট্যে জীবন-যাপনের প্রণালীতে, আচারে, বিচারে এবং প্রচারে বহুবিধ নূতনত্বের আবির্ভাব ঘটে। ইহা যদি না ঘটে, তাহা হইলে বলিতে হইবে, এই নবভাবের উন্মেষের ভিতরে অসম্পূর্ণতা আছে। ১৯০৫ ইংরাজীতে বাঙ্গালী স্বাধীন ভারতের এক নবীন স্বপ্ন দেখিয়াছিল। গিরীশচন্দ্র, ক্ষীরোদপ্রসাদ, দ্বিজেন্দ্রলাল প্রমুখ নাট্যকারেরা সেই ভাবের আন্দোলনকে অস্বীকার করিতে পারেন নাই। নবীনচন্দ্র, রঙ্গলাল, হেমচন্দ্র প্রভৃতির কবিতা তখন কণ্ঠে কণ্ঠে মুখস্থ হইতেছিল। রবীন্দ্রনাথ, রজনীকান্ত, হেমকবি, সতীশচন্দ্র, কামিনীকুমার প্রভৃতির লেখনীতে ও কণ্ঠে স্বাদেশিকতার বিজয়মন্ত্র ধ্বনিত হইয়া উঠিতেছিল। কিন্তু ১৯২১-এর মহাত্মা গান্ধীর আন্দোলন সাহিত্যিক প্রতিভার সেই সৌষ্ঠবের গর্ব্ব করিতে পারে না। ইহা হইতে অনুমান করিতে হইবে যে, এই আন্দোলনের কোথাও মজ্জাগত কোনও দুর্ব্বলতা ছিল। মহাত্মা গান্ধীর আন্দোলন যে স্বাধীনতা আনিয়া দিয়াছে, তাহার ফলস্বরূপে বর্ত্তমানে যেই সকল লজ্জাজনক পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটিয়াছে, সেগুলি আমাদের দ্বারা অনাবিষ্কৃত সেই মজ্জাগত দুর্ব্বলতার ফল কি না, হয়ত ইহা অনেক চিন্তাশীল মানুষ ভাবিতে সুরু করিয়াছেন। যেই স্বাধীনতা আসিলে অসাম্প্রদায়িক পার্থিব রাষ্ট্রে ভোট-সংগ্রহের সময়ে ক্ষমতাবান পুরুষেরা অতীব কদর্য্য সাম্প্রদায়িকতার আশ্রয় নেন, যেই স্বাধীনতা আসিলে যাবতীয় ভারতীয়ের জন্য একটিমাত্র বিবাহের আইন

বিধিবদ্ধ না হইয়া কেবল হিন্দুদের জন্যই বিবাহ-আইন প্রণীত হয়, যেই স্বাধীনতা আসিলে ভিন্নধর্ম্মাবলম্বী গুণ্ডার দ্বারা আক্রান্ত নিরীহ ব্যক্তি আত্মরক্ষার্থ দণ্ড ধারণ করিলে অনেক সময়ে এই আক্ষেপ করিতে বাধ্য হয় যে, নির্দ্দিষ্ট সম্প্রদায়ভুক্ত হইয়া জন্মানোটা একটা মস্ত অপরাধ, যেই স্বাধীনতা আসিলে চোরাকারবারীদের ফাঁসি হয় না কিন্তু মন্ত্রীদের উক্তি প্রত্যুক্তি প্রভৃতিতে লোকের মনে এই সন্দেহ জাগে, ভারতে একটী ব্যক্তিও বোধ হয় চোরাকারবারীর কালোবাজার বন্ধ করিতে সক্ষম নহেন এবং অধিকাংশ ক্ষমতাবান্ পুরুষই ইহা বন্ধ করিতে ইচ্ছুক নহেন, সেই স্বাধীনতাই কি মহাত্মা গান্ধীর সমস্ত জীবনের অবিস্মরণীয় সাধনা এবং অকল্পনীয় আত্মত্যাগের ফল রূপে আত্ম-প্রকাশ করে নাই? যেই স্বাধীনতা আসিলে স্বাধীনতার প্রকৃত ইতিহাস রচনা করিতে প্রকৃত ঐতিহাসিকের লেখনী স্বাধীনতা পায় না, মহাত্মা গান্ধী আততায়ীর আগ্নেয়াস্ত্রে নিহত হইয়া কি সেই স্বাধীনতাই আমাদিগকে আনিয়া দিয়াছেন? দেশে সত্যভাষীর সংখ্যা কমিয়া যাইতেছে। সত্য-কথকের সংখ্যা আরও কম। এই জন্যই ভারতের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতার দ্বারাই যাঁহারা জগতের সুনাম অর্জ্জন করিয়াছেন, এই সেইদিন পর্য্যন্ত সেই সকল নিকৃষ্ট জীবেরা ভারতের শ্রেষ্ঠ নেতাদের বন্ধু ছিল। কেন ছিল? শ্যামাপ্রসাদের মতন দেশ-প্রেমিকের কারাগারে অপমৃত্যু কি স্বাধীন দেশে হয়? কোনও স্বাধীন দেশ কি সুভাষচন্দ্রের মত নেতাকে অজ্ঞাত স্থান হইতে উদ্ধারের চেষ্টায় বিমুখ হয়? মহাত্মা গান্ধীর আন্দোলনে লব্ধ স্বাধীনতার ইহাই কি রূপ নহে?

অতীতে ভারতে যেই আন্দোলন হইয়া গিয়াছে, তাহাই ভারতের

শেষ ইতিহাস নহে। ভারতেতিহাসের যবনিকাপাত হইয়া যায় নাই। এই মহানাট্যের অনাগত আরও বহু অঙ্ক রহিয়া গিয়াছে। সেই অঙ্ক এবং গর্ভাঙ্ক সমূহ তোমাদিগকেই রচনা করিতে হইবে। রাজনীতির চর্চ্চা করিয়া নহে, রাজনীতিচর্চ্চাকারী নেতৃগণের গৃহীত পদ্ধতির অসারতা উপলব্ধি করিয়া এমন এক সুস্থ, সবল, স্বাবলম্বী সামাজিক জীবন তোমাদিগকে প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে, যাহার ফলে একদা তিনশত বৎসরের পরে জীর্ণ, শীর্ণ, দীর্ণ ভারতবর্ষ নবযৌবনশ্রীতে মণ্ডিত হইয়া শ্লাঘার কনক-কিরীট শিরে ধারণ করিয়া উন্নত মস্তকে জগৎ সমক্ষে দাঁড়াইয়া বলিতে পারিবে,—"আমি পৃথিবী হইতে মুছিয়া যাই নাই, আমি আছি।"

তোমরা সেই দিকে তাকাইয়া গান গাও। তোমরা সেই দিকে তাকাইয়া নাটক রচনা কর। তোমরা সেই দিকে তাকাইয়া গল্প-উপন্যাস লেখ। বাংলার বুকে যখন বিপ্লব-চিন্তার ঝড় চলিতেছে, দলে দলে যুবকেরা মাতা-ভগিনীকে কাঁদাইয়া হিজলী, দেউলী, বক্সা, বহরমপুর প্রভৃতি বন্দীশালায় কারারুদ্ধ জীবন-যাপন করিতেছে, সেই দিন বাংলার এক মহাকবি সভ্য-সমাজে নারীনৃত্যের চপল বিলাসকে প্রচলিত করিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছিলেন। যাঁহার কণ্ঠে স্বদেশী সঙ্গীত শুনিয়া বাঙ্গালী যুবকের দল, তাঁহারই ভাষায়, "জীবন মৃত্যু পায়ের ভৃত্য চিত্ত ভাবনা হীন" করিয়া ফাঁসির মঞ্চে জীবনের জয় গান গাহিয়া গেল, সেই মহাকবির নারীনৃত্য প্রচলনের ফলে বাঙ্গালী যুবকের চরিত্রের মেরুদণ্ড দুর্ব্বল হইবে বলিয়া আশঙ্কা করা হইয়াছিল। একটী লেখনী, তাহা প্রাতঃস্মরণীয় কৃষ্ণকুমার মিত্রের, "সঞ্জীবনীর" পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় তাহার প্রতিবাদ করিয়াছিল। একটী কণ্ঠ, তাহা এই দীন

নগন্য আমার, শত শত বক্তৃতা-মঞ্চে নির্ভয়ে তাহার প্রতিবাদ করিয়াছিল। ইহা আমাদের অসৌজন্য হইতে পারে, অথবা মহাজনের মহাভাব উপলব্ধি করিবার শক্তির অভাব হইতে পারে কিন্তু আজও আমি বিশ্বাস করি, নারীনৃত্যের চপল বিলাস শক্তিমান জাতিসৃষ্টির অনুকূল নহে। জাতিসৃষ্টি তোমরা প্রধান ব্রত বলিয়া জ্ঞান করিও এবং তাহারই দিকে তাকাইয়া তোমরা চিন্তা করিও, কথা বলিও, অনুষ্ঠানের কর্ম্মসূচী স্থির করিও।

আপাতত এইখানে শেষ। তোমরা তোমাদের ব্রত ভুলিও না। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৩)

হরি-ওঁ

মঙ্গলকুটীর
বুধবার, ১৫ই অগ্রহায়ণ, ১৩৭২
১।১২।৬৫ ইং

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

ধান্য "লেভি"র দুরন্ত ত্রাসের মধ্যে ব্যতিব্যস্ত থাকা সত্ত্বেও আলকুশার চারিটী চাষী গৃহস্থ আমাদের ধান বিনা পারিশ্রমিকে কাটিয়া দিয়া গিয়াছে। এই ত্রাস ও আতঙ্ক সৃষ্ট না হইলে ঐ গ্রাম হইতে কমপক্ষে ত্রিশজন পুরুষ কাস্তে হাতে আসিত। কামনাগড়া আশ্রমের পাশের গ্রাম। দূরের এক গ্রামের চারিজন আসিয়া নিঃস্বার্থ শ্রমদান

করিয়া যাওয়ার দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত হইয়া পরশ্ব কামনাগড়ার সতর জন কৃষক আসিয়া সারাদিন আশ্রমের ধান কাটিয়া দিয়া গিয়াছে। আরও আঠারো বিশজন লোক ঐ গ্রাম হইতে আসিয়াছিল, যাহারা পারিশ্রমিক নিয়াছে। সকলেই প্রাণ ভরিয়া খাটিয়াছে এবং পারিশ্রমিক নেউক আর না নেউক, প্রত্যেককেই পেট ভরিয়া খাওয়াইয়াছি। এই ব্যাপারের শ্রম তুমি অনুমান করিতে পারিবে না। সরকারী রেশনের নিক্তিমাফিক খাবার খাইলে এদেশের গ্রাম্য লোক দুইটী বৎসরে যক্ষ্মা হইয়া উজাড় হইবে।

কাল আমরা পুরুলিয়া গিয়াছিলাম। সমবেত উপাসনায় যোগ দিতে জামশেদপুর হইতে সাত জন এবং চক্রধরপুর হইতে জনা পাঁচেক আসিয়াছিল। পুরুলিয়া হইতে ফিরিবার কালে রাত্রি দশটার সময় জামশেদপুরের অনন্ত, ক্ষেত্র ও নিরঞ্জনকে জোর করিয়া "কারে" চাপাইয়া লইলাম। তাহাদিগকে একটা প্রাতঃকাল হইলেও ইট টানিতে হইবে। গাড়ীতে জায়গা থাকিলে বাকী কয়জনকেও টানিতাম। জামশেদপুরের ছেলেরা সকাল হইতে ইট টানিতেছে, আমার শরীরে জ্বর বলিয়া বসিয়া বসিয়া দেখিতেছি, সমর্পণ পাঁজার উপরে উঠিতে গিয়া রক্তাক্ত শরীরে পড়িয়া গেল। আমি সুযোগ পাইলাম, ঘরে বসিয়া চিঠি লেখাইব। "কাজ-কাজ-কাজ"—ইহাই এখানকার মর্ম্মকথা। কেহ কথা কহিতে আসিলে, তাহাকে সমাদর করা এখানে এক দুঃসাধ্য ব্যাপার।

মাটিয়ালরা কম্বল চাহিতেছে। শীতে লোকগুলি জড়সড়। নিজে কিছু দাম বহন করিয়া উহাদের কয়েকখানা কম্বল দিব ভাবিতেছি। কিন্তু হাতে সম্বল নাই। চেষ্টায় রহিলাম, কি করিতে পারি। তোমার

কাছে আমার তহবিলের যদি কোন টাকা থাকে, তাহা হইলে তাহা হইতে কি ব্যবস্থা সম্ভব?

অবশ্য গরীবকে দান করিয়া দুঃখ কদাচ নিবারণ করা যাইবে না। তাহার উপার্জ্জনের যোগ্যতা বর্দ্ধনের সফল প্রয়াসই প্রকৃত মীমাংসা। অন্য যুক্তি কথার কথা মাত্র। দান-ধর্ম্মের উপদেশ অনাদি কাল হইতে সর্ব্বসম্প্রদায়ের আচার্য্যেরা দিয়াছেন। আমি মনে করি, যোগ্যতা-দানই সবচেয়ে বড় দান। দান-ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা আমি স্বীকার করি কিন্তু কজনের দান যখন অপরকে পরমুখাপেক্ষী করে, তখন সেই দান সর্ব্বনাশেরই নামান্তর। দাতাকে শতবর্ষজীবী হইবার আশীর্ব্বাদ করা হইয়াছে কিন্তু আমার মতে সেই দাতাকে সহস্রবর্ষ-জীবী হইবার আশীর্ব্বাদ করা উচিত, যিনি দানের পাত্রকে পরমুখাপেক্ষা বর্জ্জন করিয়া স্বশক্তিতে নিজের অভাব নিজে ঘুচাইতে সহায়তা করিবেন।

আমার মালটিভারসিটি বা বিশ্ববিদ্যাকেন্দ্রের লক্ষ্য ইহা। এই জন্যই তোমাদের আন্দোলনের মধ্যে মজ্জাগত কোনও দুর্ব্বলতা যাহাতে কদাচ না প্রবেশ করিতে পারে, তদ্বিষয়ে আমার আগ্রহ-ব্যাকুল মনের সতর্কতা এত বেশী। ধনীদের দানে আন্দোলন চালাইতে গিয়া জগতের এক শ্রেষ্ঠ পুরুষ ভারতের রাজনীতি এবং রাজপুরুষগণকে মুষ্টিমেয় ধনশালীর ভ্রূভঙ্গের অধীন করিয়াছেন। সরকারী দানের প্রত্যাশায় বড় হইতে আকাঙ্ক্ষা করিয়া জগতের আর এক শ্রেষ্ঠ পুরুষের এক সুমহতী বিশ্বকীর্ত্তি শুনিতেছি নাকি স্বকীয় বৈশিষ্ট্য হইতে বর্জ্জিত হইতে চলিয়াছে। একজন মহাত্মা গান্ধীর অমরত্ব তাঁহার চরিত্রে। একজন কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথের অমরত্ব তাহার মানবিকতায়। তাঁহাদের স্নেহপুষ্ট সংঘ বা তাঁহাদের স্বহস্ত-নির্ম্মিত প্রতিষ্ঠান যদি অমিত-

অর্থধর ব্যক্তি বা সংস্থার নিকটে কদাচ যাচক হয়, তবে তাহার পরিণতি কি হইতে পারে, ইহারই জাজ্জ্বল্যমান দেওয়ালের লিখন এইখানে। এত সব অনুমান করিবার মতন দূরদৃষ্টি আমার সেইদিন ছিল না, যেদিন অভিক্ষাকে জনসেবার মূলমন্ত্ররূপে আমি গ্রহণ করি। আজ আমি সুস্পষ্ট রূপে উপলব্ধি করিতেছি যে, আমার সেদিনকার পন্থা-নির্ণয় ভুল হয় নাই। কেবল ভিক্ষা, কেবল দান, কেবল অনুগ্রহ, ইহা পরভৃতের সংখ্যা বাড়াইতে পারে, ইহার ফলে সকলেই আমরা হয়ত কোকিলকূজনে কথা কহিব কিন্তু সবল-মেরুদণ্ড-বিশিষ্ট বলিষ্ঠ মানুষ হইতে পারিব না।

বলের প্রয়োজন বাঁচিবার জন্য, বাঁচিবার প্রয়োজন বলের সুপ্রযোজ্য সদ্ব্যবহারের জন্য। হিংসা বা অহিংসার নীতিজ্ঞানকে ইহার সহিত জড়াইয়া ফেলা ভুল। একজন ধর্ম্মার্থে নিজ ব্যক্তিগত জীবনে পশু-পক্ষি-মৎস্যাদি ভক্ষণে বিরত থাকিতে পারেন কিন্তু একটা জাতি যুদ্ধজয়ের প্রয়োজনে কেবল পুঁইশাক আর ঢেঁকিশাকের উপর নির্ভর করিতে পারে না। গুরু গোবিন্দকে শিখ জাতিকে যুদ্ধার্থে প্রস্তুত করিতে হইয়াছিল। তাই তিনি ভারতীয় সাধু মাত্রের পক্ষে চিরবর্জ্জিত আমিষকে শিখের আহার্য্যরূপে স্বীকার করিয়া নিতে উৎসাহী হইয়া ছিলেন। জীব-কল্যাণার্থে যেখানে দেহধারণ, সেখানে প্রথম প্রশ্ন, এই জীবন জীবকল্যাণার্থেই উৎসর্গ করিব কিনা। কেবল স্বার্থ সেবিবার জন্য যেই দেহ, তাহাকে নিরামিষ খাদ্যে পুষ্ট করিলেও ধর্ম্ম হয় না। মানুষকে কাঁচকলা-সিদ্ধই খাইতে শিখাইলাম কিন্তু মুনাফাবাজীর অনৈতিক পন্থা হইতে বিরত করিতে পারিলাম না, ইহা জাতির অহিংসাও নহে, বলবত্তার পরিচয়ও নহে। জাতি বলবান হয় ত্যাগে এবং আত্মত্যাগই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ত্যাগ।

প্রচলিত সামাজিক, রাজনৈতিক, ধার্ম্মিক সংস্কার সমূহের সহিত বিরোধ না করিয়া এবং তাহাদের দ্বারা কোনও বিরোধ হইলে তাহার পরোয়া না রাখিয়া মূল লক্ষ্যের দিকে তীব্র দৃষ্টি দিয়া একাগ্রমনে চলিতে হইবে। চলিব আমরা তিনশত বৎসর, এই পণ করিতে হইবে।

সাম্প্রতিক সাম্প্রদায়িক এবং রাজনৈতিক হট্টগোলগুলির মধ্য হইতে আমাদিগকে দূরে থাকিতে হইবে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৪)

হরিওঁ

মঙ্গলকুটীর

১৫ই অগ্রহায়ণ, ১৩৭২

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

শরীরের দুর্ব্বলতা বা স্নায়ু মণ্ডলীর বিকলতা প্রভৃতিতে মোটেই দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হইও না। এই দুর্ব্বলতা বা এই বিকলতা যেই কারণেই আসিয়া থাকুক, ইহার নিরাময়ের জন্য আমি এক অদ্ভুত ঔষধ আবিষ্কার করিয়াছি, যাহা অমৃততুল্য অব্যর্থ এবং দাবাগ্নিতুল্য অমোঘ। উহার নাম জগন্মঙ্গল-চিন্তা। হাত, পা, নাক, মুখ, চোখ, কান সব তুমি জগতের মঙ্গলকল্পে মনে মনে উৎসর্গ করিতে থাক। দেহ, মন, প্রাণ, আত্মা সব কিছু মনে মনে জগতের কল্যাণে উৎসর্গ করিতে থাক। মনে মনে মহা যজ্ঞানল প্রজ্জ্বলিত করিয়া নিজেকে নিরন্তর তাহাতে

আহুতি দিতে থাক। ইহাতে সর্ব্বব্যাধি নিরাময় হইবে।

মণ্ডলীর অন্তর্ভুক্ত অনেকে আমার মত ও পথকে সঠিক ভাবে জানে না। তাহাদের এই অজ্ঞতা যে কোনও কোনও ক্ষেত্রে দুর্ব্বলতার এবং কোথাও কোথাও অন্ধ গোঁড়ামির সৃজয়িত্রী, তোমার এ কথাটী সত্য। অখণ্ড-সংহিতা পড়াইয়া পড়াইয়া তাহাদের অজ্ঞানান্ধকার দূর কর। অজ্ঞানতা দূর করার চাইতে বড় সেবা আর কিছু নাই। নিত্য পাঠে কুসংস্কার যায়, অন্ধতা দূরীভূত হয়। মনের উপরে সৎপ্রবৃত্তির ছাপ পড়ে এবং চিত্ত সর্ব্বালিঙ্গনকারী প্রেমভাবে অভিভূত হয়। কীর্ত্তন আনে আনন্দ ও উন্মাদনা, পাঠ দেয় শান্তি এবং সান্ত্বনা, জপের ফল প্রত্যক্ষ ও প্রত্যয় এবং ত্যাগের ফল স্থৈর্য্য ও শুদ্ধতা। যে কোনও একটার উপরে অত্যধিক রোখ্ না দিয়া একটা সুসমঞ্জস সমন্বয়ের মধ্য দিয়া প্রত্যেকটার চর্চ্চা চালাইয়া যাও। উপদেশ আমার প্রাণ হইতে নির্গত হইতেছে, মুখ হইতে নহে। তোমরাও ইহা প্রাণ দিয়া গ্রহণ করিও, শুধু কানে শুনিয়াই ক্ষান্ত হইও না।

নিজেদিগকে নির্ম্মাণ-যজ্ঞে আহুতি করিবে যাহারা, তাহাদের একদিকে প্রয়োজন সরলতার, অপর দিকে প্রয়োজন ঐকান্তিকতার। মরিতে একদিন প্রত্যেককেই হইবে। তবে ভালভাবেই মরিব না কেন? দুর্ভিক্ষে কেন মরিব? দুর্দ্দৈন্যে কেন মরিব? মরিতে হয় মরিব প্রত্যক্ষ যুদ্ধক্ষেত্রে। সমগ্র জাতির ভিতর যুগপৎ ব্রহ্মানুভূতি এবং ক্ষাত্রবীর্য্যের প্রকটন ঘটাইতে হইবে। অপরকে ক্ষয়, ক্ষতি ও ক্ষত হইতে ত্রাণ করে বলিয়াই ইহাদের নাম ক্ষত্রিয় হইয়াছে। পরত্রাণই যাহার ব্রত, সে ক্ষত্রিয়। আত্মত্রাণই যাহার লক্ষ্য, সে বৈশ্য। আত্মত্রাণেও যাহার রুচি নাই, সে শূদ্র। বিশ্বত্রাণ যাহার লক্ষ্য, সে ব্রাহ্মণ।

আমি বিশ্বকে ব্রাহ্মণময় করিতে চাহি। তাই, কাশী-কাঞ্চি নবদ্বীপের পাণ্ডিত্য আমাকে স্তব্ধবাক্ করিতে পারে নাই। প্রাণাত্যয়সম্ভাবনাকে শতবার তুচ্ছ করিয়া আমি দীন-হীন নগণ্যের দুয়ারে দাঁড়াইয়া উচ্চকণ্ঠে চীৎকার করিয়া বলিয়াছি,—"এস, ব্রাহ্মণ হও।" কিন্তু শুধু ব্রহ্মগায়ত্রী কানে শুনিলেই কেহ ব্রাহ্মণ হয় না, জগন্মমঙ্গলকে ব্রত স্বরূপ করিতে হইবে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৫)

হরি-ওঁ

মঙ্গলকুটীর

শুক্রবার, ১৭ই অগ্রহায়ণ, ১৩৭২

৩-১২-৬৫ ইং

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

পূর্ব্ববঙ্গে পূর্ব্বপুরুষের বাস্তুভিটা এবং যাবতীয় সম্পদ ত্রস্ত-ব্যস্ততায় ফেলিয়া আসিয়া যেখানে আসিয়া শিবিরের ভিক্ষান্ন ভোজন করিতেছ, মনুষত্বের পরিবিকাশের বা দিব্যভাবের অনুশীলনের পক্ষে অনুকূল স্থান উহা নহে। তথাপি যে তুমি নিজের কাজ ছাড়িয়া দাও নাই অর্থাৎ মানুষ মাত্রেরই অন্তরে স্বার্থ জগতের ঊর্দ্ধের বাণী জাগাইয়া তুলিতে চেষ্টা করিতেছ, ইহাতে আমি খুবই খুশি হইয়াছি। একাজ প্রত্যেকে যদি নিজ নিজ শক্তি-সাধ্যানুযায়ী সর্ব্বত্রই কেবল করিয়াই যাইতে থাকে, তাহা হইলে সকলের সম্মিলিত চেষ্টার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র

সুফল মিলিত হইয়া একটা বিরাট, ব্যাপক ও মহনীয় নবজাগরণ বিশ্বব্যাপিয়া সৃষ্টি করিতে সমর্থ হইবে। "সৃষ্টি আমরা করিব", এই সঙ্কল্প রাখিবার প্রয়োজন নাই। কাজ যদি করিয়া যাও, কর্ম্মের হলচিহ্ন অনুসরণ করিয়া সৃষ্টির কাজ আপনা আপনি আরম্ভ হইয়া যাইবে।

যে সকল শিবির-বাসী উদ্বাস্তুদের মধ্যে প্রাণের যোগ স্থাপনে সমর্থ হইয়াছ, তাহারা নানাস্থানে পুনর্ব্বাসিত হইয়া যাইবার পরে তাহাদের সহিত যোগাযোগ রক্ষা করিবার প্রয়োজনে অবশ্যই তাহাদের নাম-ঠিকানা রক্ষা করিও। মানুষের মনে নূতন ভাবের সহিত পরিচয়টুকু সৃষ্টি করাই যথেষ্ট নহে। এই পরিচয়টুকুকে নিবিড় এবং গভীর করিবার জন্য ধারাবাহিক প্রয়াসের প্রয়োজন। সৎপ্রয়াস অনেককেই করিতে দেখি কিন্তু তাহাতে ধারাবাহিকতা থাকে না বলিয়া সঙ্গত প্রয়াসও ব্যর্থতার শূন্যে মিলাইয়া যায়, অসাফল্যের অতলে তলাইয়া যায়। সুতরাং কর্ম্মের ধারাবাহিকতাকে গুরুত্ব দিতে হইবে।

আমি প্রতিভাবান পুরুষও নহি অথবা অসামান্য শক্তি-সামর্থ্যসম্পন্ন কোনও লোকোত্তর-চরিত মানুষও নহি। তাই আমি হঠাৎ কাজ করিয়া হঠাৎ সাফল্যের আশা জীবনে কখনও রাখি নাই। বহু কাজ করিয়াও হয়ত সাফল্য আসিতে না পারে কিন্তু ধারাবাহিক প্রযত্নে স্বল্প স্বল্প কাজ নিয়মিত নিষ্ঠায় করিয়া যাইতে থাকিলে একদা সাফল্য যে সুনিশ্চিত পদানত হইবে, ইহা আমি জীবনে বারংবার প্রত্যক্ষ করিয়াছি। এই জন্যই অধ্যবসায়কে আমি অশেষ গুরুত্ব দিয়া থাকি। কর্ম্মের ধারাবাহিকতারই অপর নাম অধ্যবসায়।

তোমরা কদাচ খাপছাড়া ভাবে কাজ করিও না। অধ্যবসায় যেখানে নাই, কাজ সেখানে খাপছাড়া হইবেই হইবে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৬)

হরিওঁ

মঙ্গলকুটীর

শনিবার, ১৮ই অগ্রহায়ণ, ১৩৭২

৪-১২-৬৫

কল্যাণীয়েষু,—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

তোমার পত্র পাইয়া সুখী হইলাম। স্বপ্নে দেখিয়াছ আমি মরিয়া গিয়াছি এবং সবাই মিলিয়া কান্নাকাটি করিতেছ। এ স্বপ্ন দেখা ভাল। তোমরা এইরূপ স্বপ্ন দেখিলে বুঝিব যে, আমি কিছুদিন বাঁচিব। আমি জীবিত থাকা কালে তোমরা কয়জনে আমার কথা শুনিয়াছ? আদেশ অপালনের মধ্যে তোমাদের অধিকাংশ কৃতিত্ব। দীক্ষা লইয়াছ ত' সাধন কর না। সাধনে রুচি আছে ত' সমবেত উপাসনায় যাও না। সমবেত উপাসনা কর ত' সঙ্গে সঙ্গে ঝগড়া-কোন্দল বাঁধাও। দৈবাৎ কাহারও সঙ্গে কলহ বাঁধিয়া গেলে সে কলহের আর মৃত্যু পর্য্যন্ত কোন মীমাংসা হয় না। এমন একটা কুশ্রী সামাজিক পরিবেশের মধ্যে তোমাদের জন্ম, বৃদ্ধি ও পোষণ চলিতেছে যে, ইহার অতিরিক্ত অন্যবিধ আচরণ হয়ত প্রত্যাশাও করা চলে না। যেই সকল আচার্যপাদেরা বলিতেছেন,— "হে শিষ্যগণ, আমাকেই ভজনা কর, আমি ঈশ্বরাবতার বা অপ্রেমেয়

অনাদি অনন্ত শাশ্বত পুরুষ", তাঁহাদের শিষ্যদের মধ্যে বরং ইহার কিঞ্চিত অন্যথা দেখা যায়। আমিও যদি আমার পূজা প্রবর্ত্তনের কৌশল ধরিতাম বা অপরে আমার পূজা প্রবর্ত্তনে চেষ্টিত রহিয়াছে দেখিয়া খড়্গহস্ত না হইতাম, তাহা হইলে হয়ত এই সকল অসঙ্গতি, অসম্পূর্ণতা, দোষ এবং ত্রুটি তোমাদের মধ্যে দেখা যাইত না। কিন্তু যেই সর্ব্বজনীনতার উপরে আমার উপলব্ধি প্রতিষ্ঠিত, তাহা আমাকে আমার পূজা-প্রবর্ত্তনে খড়্গহস্ত হইতে বাধ্য করিতেছে। আমি নিজেকে নিজে যাহাই জানিয়া থাকি না কেন এবং স্বরূপে আমি যাহাই হইয়া থাকি না কেন, আমার আবাল্য সাধনা আমাকে যেই সংসিদ্ধিতেই পৌছাইয়া থাকুক না কেন, আমি বিশ্বজগতের প্রতিটি প্রাণীর সহিত সমান, সামান্য এবং সমসাধকই থাকিতে চাহি। সুতরাং আমি তোমাদিগকে বলিতে পারি নাই, "আমার আদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করিতে হইবে। নতুবা তোমাদের মঙ্গল নাই।"

তোমরা দলে দলে আসিয়া দীক্ষা নিয়াছ এবং যে অসামান্য স্বাধীনতা আমি তোমাদিগকে দিয়াছি, তাহার ব্যবহার করিয়াছ। ইহার অধিকাংশই যে স্বাধীনতার অসদ্ব্যবহার, তাহা জানিতে, বুঝিতে বা ভাবিতে তোমরা চেষ্টা কর নাই। তোমাদের পক্ষে আমার মৃত্যুর স্বপ্ন দেখা ভাল। কারণ, আমি বাঁচিয়া থাকিতে ত' তোমরা আমার জন্য কাঁদিবে না।

কোনও কোনও ধর্ম্মাচার্য্যের শিষ্যেরা মাঝে মাঝে আমার মৃত্যু-সংবাদ প্রচার করিয়া থাকেন। তোমরা আতঙ্কিত ও শঙ্কিত হইয়া টেলিগ্রামে টেলিগ্রামে ধানবাদ আর বারাণসীর বার্ত্তাবহ-কার্য্যালয় আচ্ছন্ন করিয়া ফেল। এরূপ ঘটনা অনেকবারই ঘটিয়াছে। তখন তোমরা

আতঙ্কিতই হইয়াছ, কাঁদ নাই। কেন না, খবরের কাগজে ত' ইহা বাহির হয় নাই। কিন্তু আজি-কালিকার সংবাদপত্রের সম্পাদকেরা কি "সঞ্জীবনী"র সম্পাদক কৃষ্ণকুমার মিত্রের মতন মূর্খ লোক যে, আমার মতন একটা নগণ্য কর্ম্মীর সম্পর্কিত একটা সংবাদ বিনা তদ্বিরে ছাপাইবেন? সুতরাং সত্যি সত্যি মরিবার পরে আনন্দবাজার, যুগান্তর বা বসুমতীতে আমার মৃত্যু-সংবাদ নাও পাইতে পার। সুতরাং সত্য সত্য মরিয়া গেলে কাঁদিবার তোমাদের অবকাশ নাও হইতে পারে। কিন্তু স্বপ্নে মৃত্যু বড় চমৎকার জিনিস। তাহাকে সত্য বলিয়াই মনে হয়। স্বপ্নটা নিতান্তই যে স্বপ্ন, এ কথা তখন কাহারও মনেই আসে না। সুতরাং স্বপ্নে আমার মৃত্যু দেখিয়াছ, ভালই করিয়াছ। যাহাদের কাঁদিবার কথা নয়, তাহাদের কাঁদিতে হইয়াছে। যদিও ইহা স্বপ্নের অলীক কান্না, তথাপি ইহা তোমাকে ও তাহাদিগকে আমার নিকটতর করিয়াছে। যে যাহার জন্য কাঁদে, সে-ই তাহার নিকট হয়। না কাঁদিতে পারিলে কে কাহার নিকট হইত, কে কাহার আপন হইত?

এই জন্যই তোমার পত্র পাইয়া অতীব সুখী হইয়াছি।

যে দুইটী মণ্ডলীতে সমবেত উপাসনা করিতে গিয়াছিলে, সেখানে কাহারও সুরের সহিত প্রকৃত সুরের কোন সম্পর্ক নাই দেখিয়া অবাক হইয়াছ। সকলকে যে শুদ্ধ সুর শিখাইতে পারিলাম না, ইহার মধ্যে আমার চেষ্টার কিছু ত্রুটি আছে। কিন্তু সুর যাহারা শিখিবে, তাহাদেরও আগ্রহের অভাব। গ্রামোফোন রেকর্ড করিলাম। এক হাজারখানা রেকর্ড পাঁচ বছরে লোককে গছাইতে পারিলাম না। এখন ত গ্রামোফোন-কোম্পানী আগের ছাঁচ ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছেন। পুনরায় রেকর্ডিং করিবার জন্য অনেক চেষ্টা করিয়াও বিফল হইয়াছি। এখন চেষ্টা চালাইতে হইলে

যাহা করণীয়, তাহাতে সকলের আগ্রহ প্রয়োজন। যাহারা যাহারা শুদ্ধ সুর জানো, তাহারা তাহারা অপরকে সুর শিখাইবার চেষ্টা কর।

পুত্র তোমার চাকুরীতে ঢুকিয়াও পড়ার সুযোগ গ্রহণ করিতেছে না; পড়ার বহির সামনে বসিলেই ঘুমায়। ইহা কোন কঠিন রোগ নহে। ইহার ঔষধ সরল এবং সোজা। সেই ঔষধের নাম উচ্চাকাঙ্ক্ষা। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৭)

হরি-ওঁ

মঙ্গলকুটীর
১৮ই অগ্রহায়ণ, ১৩৭২

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তোমার পত্র পাইয়া সুখী হইলাম। আগে আশ্রমের খবর শোনো। আলকুশা গ্রাম এখান হইতে তিন মাইল সাড়ে তিন মাইল দূর। গ্রামটী ছোট এবং দরিদ্র কিন্তু প্রাণবত্তায় তাহারা গরীব নহে। ধান্য-লেভির আতঙ্কে গ্রামের লোক জড়সড়। তবু কাল জনা আটেক ভক্ত কৃষক আসিয়া আশ্রমের মাঠের ধান কাটিয়া দিয়া গিয়াছে। ইহাদের প্রাণবত্তার প্রশংসাটুকু তোমাদের না শুনাইয়া পারিলাম না।

আশ্রমের ধান কাটা খতম হইয়াছে। এখন যা কিছু কুলী কামিন পাওয়া যায়, তাহা লইয়া গাথুনির কাজে প্রায় একাগ্র মনঃসংযোগ

করা চলিবে। প্রায় কথাটা বলিলাম এইজন্য যে, এখানে বিস্তীর্ণ ফুলের চাষ আছে। সেই বীজ এখন পাকিতেছে। ফুলের বীজ সংগ্রহ করাটা পাকা ধান সংগ্রহ করা অপেক্ষা অনেক কৌশলের ব্যাপার। অশিক্ষিত অপটু লোক দ্বারা একাজ হইবে না। পঁচিশ ত্রিশ হাজার ফুল গাছে ফুল ফুটিয়াছে। এ-দৃশ্য তোমরা দেখিলে না। স্বর্গ হইতে দেবতারা হয়ত দেখিবার জন্য সঙ্গোপনে কেহ কেহ নামিয়া আসিয়াছিলেন। কিন্তু শহর হইতে দূরে বনবাদাড়ে ঘেরা এই নির্জ্জন তপোবনে এ ফুল দেখিবার সাধই বা কাহার হইবে, সৌভাগ্যই বা কাহার ঘটিবে? কিন্তু এমন চোখ-জুড়ানো প্রাণ-ভোলান দৃশ্য দেখিবার জন্য একটা মিনিট পুষ্পোদ্যানে দাঁড়াইতে পারি নাই। আমাকে ইট টানিতে হইতেছে, পাথর কুড়াইতে হইতেছে, ঝঙ্কার দিয়া হুঙ্কার মারিয়া কুলী-কামিন খাটাইতে হইতেছে। আমি এখন ভাষণ-মঞ্চের বক্তা নহি। আমি এখন কুলী-মজুরের সর্দ্দার। নয়ন-মনোহর কুসুম সমারোহ দেখিবার জন্য স্নিগ্ধ নয়নে দুই মিনিট তাকাইবার আমার অবসর কৈ?

আজ কয়েক খানা ধানক্ষেত হইয়াছে। ক্ষেতগুলি কর্ম্মীদিগকে অন্ন দিতেছে। কিন্তু যখন ক্ষেত ছিল না, তখন হইতে পুষ্পোদ্যান সকলকে পরোক্ষ ভাবে অন্ন জোগাইতেছে। সুতরাং আশ্রমের কেহ এই অপূর্ব্ব পুষ্পশোভার দিকে কবির দৃষ্টিতে তাকায় না। সদ্যঃ প্রসবিনী গাভীর দিকে গৃহস্থ যেই দৃষ্টিতে তাকায়, এখানকার কর্ম্মীদের পুষ্পোদ্যান দেখিবার দৃষ্টি সেই বস্তুতন্ত্ররীতির। কলিকাতার কাছে হইলে এই উদ্যান ফুল বেচিয়াই দশ হাজার টাকা আনিত। কিন্তু চির

দুর্ভিক্ষক্লিষ্ট এই দেশে ফুল কিনিবে কে? দুইটা ফুল চুরী করিয়া ঘরে নিবার জন্য বাগানে ঢুকিবার লোকের অভাব হয়।

এই সকল ব্যস্ততার মধ্যে তোমাকে পত্র লিখিতেছি।

পুত্রেরা পরীক্ষা দিতেছে শুনিয়া সুখী হইলাম। আশীর্ব্বাদ করি, তাহারা কৃতকার্য্য হউক। সর্ব্বদা লক্ষ্য রাখিও, পুত্রেরা যেন কদাচিৎ আদর্শ-ভ্রষ্ট হইতে না পারে। কত লোকেই ত' আমার শিষ্য হইল কিন্তু পুত্রদিগকে অখণ্ড করিতে পারিল না। অর্থাৎ এই বংশে আমার চিন্তার প্রভাব একটা পুরুষে আসিয়াই শেষ হইয়া যাইবে। ইহা সহনীয় নহে।

পিতা ও মাতা নিজেরা যদি প্রকৃত অখণ্ড না হয়, পুত্রদের কাছে অখণ্ডত্বের অনুশীলন প্রত্যাশা কি বাতুলতা নহে? কত স্থানে কতজন অখণ্ড-সমাজের নেতৃত্ব করিতেছে কিন্তু তাহার গৃহ ও সংসারে খণ্ডভাব কুপ্রথা, কুসংস্কার, মানসিক দুর্ব্বলতাজনিত লক্ষ্যহীনতা এবং কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়তা রাজত্ব করিতেছে। এই ক্ষেত্রে ইহাদের নেতৃত্ব মিথ্যা হইয়া যাইতেছে, পিতৃত্বও ব্যর্থ। নেতা অনুগত সর্ব্বসাধারণকে যদি নিজ জীবনের দৃষ্টান্ত দ্বারা অনুপ্রাণিত করিতে না পারেন, তবে নেতা নাম ধারণ করা বিড়ম্বনা মাত্র। পিতা পুত্রকে যদি উচ্চাকাঙ্ক্ষার উজ্জীবনা এবং উন্নতিমুখাভিমুখিনী প্রেরণা নিজ আনুষ্ঠানিক আচরণের মধ্য দিয়া না দিতে পারেন, তবে তিনি জগতের লোক-সংখ্যাই বৃদ্ধি করিলেন, পিতা হইলেন না। আমি চাই যে, তোমরা পিতা হও।

আমাকে অনেকে প্রশ্ন করিয়াছে,—"আপনি অনেক শিষ্য

করিয়াছেন বা অসংখ্য লোকে আপনার শিষ্য হইয়াছেন কিন্তু তাঁহাদের এই শিষ্যত্ব গ্রহণ ভাবীকালের কুশল আনয়ন করিবে কি?" এ প্রশ্ন অসঙ্গত নহে। কতজনেই ত কত শিষ্য করিয়া গেলেন এবং শিষ্যেরা গুরুদেবের অবতারত্ব প্রতিষ্ঠায় বা গুরুদেবের মূর্ত্তিপূজার প্রবর্ত্তনে আপ্রাণ পরিশ্রম করিতে লাগিল। ভাবীকালে সহস্র সহস্র চার্ব্বাক যদি এক সঙ্গে দেশ-জুড়িয়া প্রচার-কার্য্য সুরু করে ইঁহারা বাঁচিয়া থাকিবেন কি? অথবা যদি তাতার দস্যুরা মরুপথ হইতে নামিয়া আসিয়া দেশের পর দেশে কেবল অত্যাচারের অভিযান চালাইয়া যায়, ইহারা রুখিতে পারিবে কি? অথবা যদি কামানের মুখে হিমালয়ের শৃঙ্গ উড়াইয়া দিয়া পীতধূলির অকালঝঞ্ঝা সমস্ত বৃক্ষমূল উৎপাটন করিয়া ফেলে, তখন ইহারা যোগ্যভাবে পাঞ্জা লড়িতে পারিবে কি? অথবা যদি অপ্রত্যাশিত স্থান হইতে পঙ্গপাল আসিয়া মানুষের মাংস চিবাইয়া খাইতে আরম্ভ করে, তখন ইহারা মেদিনী-বক্ষে বীরদর্পে দাঁড়াইতে পারিবে কি? শিষ্য ত' হইয়াছ, দেশ, জাতি এবং জগতের ভবিষ্যৎ ভাবিয়াছ কি? ঘণ্টা নাড়া বা তিলক কাটা ধর্ম্মের অনুষঙ্গ হইতে পারে কিন্তু কেবল ঘন্টা নাড়িলে আর কেবল তিলক কাটিলে আর কেবল মালা ঠক ঠক করিলে আর অহোরাত্র কীর্ত্তনান্তে আকণ্ঠ খিচুড়ী ভক্ষণ করিলেই ধর্ম্ম হয় না। বাঁচিবার মতন বাঁচিয়া থাকিলে তবে ধর্ম্ম হয়।

সুতরাং ভাবীকালকে না ভাবিয়া পার না। এই কথাটী মনে রাখিও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৮)

হরিওঁ

মঙ্গলকুটীর
১৮ই অগ্রহায়ণ, ১৩৭২

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশীস জানিও।

তুমি এবং কল্যাণীয়া মা নি—তোমাদের দাম্পত্য সংযম-ব্রতের পঞ্চম বর্ষ নির্বিঘ্নে অতিবাহন করিতে চলিলে জানিয়া বড়ই সুখী হইয়াছি। লোকে যাহা অসাধ্য বলিয়া জ্ঞান করিত, আমার সন্তান রূপে তোমরা তাহা অনায়াসে করিয়া যাইতেছ দেখিয়া আমার শ্লাঘার অন্ত নাই। এই সংযমব্রত পাঁচটা বছরের মধ্যে তোমাদের যে কোন উদ্বেগ, অসুবিধা বা উৎপাত সৃষ্টি করিতে পারে নাই, ইহা তোমাদের ঐকান্তিকী গুরু-ভক্তিরই ফল। আমার আগামী জন্মদিনে তোমাদের ব্রতের ষষ্ঠ বর্ষ সুরু হইবে, ইহা জানিয়া বড়ই সুখানুভব করিয়াছি। তোমরা আরও তিন বৎসরের জন্য এই ব্রত গ্রহণ করিতে প্রবলভাবে আগ্রহী। আমি বলি, এখনি তিন বৎসর শব্দটা উচ্চারণ করিও না। এখন আরও এক বৎসরের জন্য ব্রত গ্রহণ কর। বৎসর শেষ হইয়া আসিলে বিহিত ব্যবস্থা করিব।

লিখিয়াছ, যেন কোন প্রলোভনের সম্মুখীন না হইতে হয় বা উহার নিকট নতি স্বীকার না করিতে হয়। লিখিয়াছ, তোমাদের এই মহাব্রত যেন মানবসমাজের উপকারে আসে। তোমাদের উভয় প্রার্থনাই সানন্দে পূর্ণ করিব। কেবল দুইটী বিষয়ে সতর্ক করিতে চাহি যে, এই ব্রতের কথা বাহিরে প্রচার করিও না এবং ব্রতের সাফল্যে কদাচ

বিন্দুমাত্র অহমিকাগ্রস্ত হইও না। এই দুইটী বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন করিলে তোমাদের সর্ব্ববিষয়ে শুভ হইবে।

ইহার পূর্ব্বে তোমাদের যে পুত্র কন্যা জন্মিয়াছে, তাহারা কেহই তোমাদের বর্ত্তমানের সংযম-ব্রতের কথা জানে না। তাই বলিয়া একথা কখনো মনে করিও না যে, তোমাদের সাধনার সুফল তাহারা পাইবে না। তোমাদের সংযমশুদ্ধ মনের ইচ্ছার প্রভাব এবং উপদেশের শক্তি তাহাদিগকে অসাধারণত্ব-অর্জ্জনে সহায়তা করিবে। যদি তাহারা তোমাদের সংযমপালনের পরে জগতে আবির্ভুত হইত, তাহা হইলে তোমাদের এই তপস্যার প্রত্যক্ষ ফলটুকু তাহাদের মধ্যে অতি সহজে বর্ত্তাইত। কিন্তু ইহাদের জন্মের পরে যে তপস্যায় নামিয়াছ, সে তপস্যাও যে ইহাদের পক্ষে বিফল হইবে না, ইহা বিশ্বাস করিও।

অতিশয় তৃপ্ত মনে তোমাদিগকে পত্রখানা লিখিতেছি। দেহকে দেহের ধর্ম্মে নিযুক্ত রাখিয়া মনকে অবিকৃত রাখিবার চেষ্টা তান্ত্রিক সাধকেরা করিয়াছেন। কেহ সফল হইয়াছেন, কেহ বিফল হইয়াছেন। দেহকে দৈহিক অনুশীলন হইতে বিরত রাখিয়া শুদ্ধ ও পবিত্র দাম্পত্যজীবন যাপন করিবার চেষ্টা তান্ত্রিকেরা ও অতান্ত্রিকেরা কেহ কেহ করিয়াছেন এবং ইহাদের মধ্যে অনেকে সফল হইয়াছেন। পূর্ব্বোল্লিখিত দৃষ্টান্ত অপেক্ষা শেষোক্ত দৃষ্টান্ত অধিকতর উৎসাহজনক। কেন না, কামক্রিয়ার মধ্য দিয়া কামজয়ের পন্থা অত্যন্ত পিচ্ছিল। তোমাদের মধ্যে যদি প্রচণ্ড কামাকূতি দেখিতাম, তবে হয়ত সেই পিচ্ছিল পথেরই উপদেশ তোমাদিগকে দিতে হইত। কিন্তু তোমরা স্বভাবতই সুন্দর। এই জন্য সরল এবং সুন্দর পথটী তোমাদের দেখাইয়াছি।

সর্ব্বদা নামাশ্রয়ে থাকিও। কত লম্পট আর কত মাতাল নামের সেবা করিতে করিতে রিপুজয়ী হইল। তোমরা লম্পট ও নহ, মাতালও নহ। তোমরা জয়ী হইবে না? ঈশ্বরের নামে নির্ভর কর। বিনীত হও, বিনম্র হও, সঙ্গে সঙ্গে আত্মবিশ্বাসী হও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৯)

হরি-ওঁ

মঙ্গলকুটীর
রবিবার, ১৯ অগ্রহায়ণ, ১৩৭২
৫।১২।৬৫

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিষ জানিও।

তোমার পত্র পাইয়া হাসিব, না কাঁদিব, বুঝিতে পারিতেছি না। ডাক্তারি-চিকিৎসা করিতে করিতে চুল পাকিতে চলিয়াছে। সর্ব্বক্ষণ মনে মনে ভাব, কি করিলে মন পাপ ও কদর্য্য বিষয় হইতে প্রমুক্ত থাকিবে। সেই সময়ে তোমার উপর সরকারী হুকুম আসিয়াছে, জন্মনিরোধের অমুক প্রণালী আর তমুক কৌশল শিখিয়া আসিতে হইবে এবং নিজ বাগানে ফিরিয়া আসিয়া চায়ের পাতা সংগ্রহকারিণী রমণীদিগকে হাতে-কলমে সব শিখাইয়া দিতে হইবে, যেন ইন্দ্রিয়-সুখভোগ ইহারা যখন ইচ্ছা, যেমন ইচ্ছা, যাহার সহিত ইচ্ছা অবাধে করিয়া যাইতে পারে কিন্তু জরায়ুতে সন্তানের আবির্ভাব ঘটিয়া সাংসারিক, সামাজিক বা আর্থিক কোনও প্রকার উৎপাত সৃষ্টি না করে। বৃদ্ধ বয়সে অতি ভাল কাজ পাইয়াছ।

এক শ্রেণীর সাধকেরা যোনিকে ঈশ্বরাবির্ভাব-ক্ষেত্র এবং লিঙ্গকে ঈশ্বরীয় স্থিতি-স্থান জানিয়া একদা পূজা করিতে চাহিয়াছিলেন। আধুনিকতাগৰ্ব্বী সুসভ্যেরা তাঁহাদিগকে ঠেলিয়া অসভ্য বর্ব্বরের পর্য্যায়ে নিয়া ফেলিয়াছেন। কিন্তু সেই সভ্যতাভিমানীদের বিজ্ঞানগন্ধিতার দাপটে তোমাদের ন্যায় অনেক প্রৌঢ় ও বৃদ্ধ ডাক্তারকে দিবারাত্র কেবল মানুষের যোনি আর মানুষের লিঙ্গেরই ধ্যান করিতে হইতেছে। কি চমৎকার পরিহাস!

ফরাসী দেশে প্রথম যখন জন্ম-নিরোধ আন্দোলন উপস্থিত করা হয়, তখন একজন মণীষী বলিয়াছিলেন যে, ইহার ফলে বিদগ্ধসমাজের পুরুষ ও নারীরা আস্তে আস্তে জনন-শক্তিহীন ও বন্ধ্যা হইবেন এবং ভবিষ্যৎ কালের ফরাসী নাগরীকদিগের জন্ম-দানের জন্য হয় পল্লীগ্রাম হইতে চাষাভূষাদের ডাকিয়া আনিতে হইবে নতুবা আলজিরিয়া হইতে কৃষ্ণাঙ্গ পুরুষদিগকে আনাইয়া জননাধিকার প্রদান করিতে হইবে। এই আশঙ্কা একেবারেই মিথ্যা হইয়াছে, এমন কথা বোধ হয় বলা চলে না।

স্বাধীনতার যোল আঠার বৎসরে খাদ্য উৎপাদনে স্বাবলম্বন-পন্থা ধরিবার বুদ্ধি যাহাদের হয় নাই, ইংরেজ এদেশ ছাড়িবার পূর্ব্ব হইতেই তাহারা অনেকে জন্মশাসনের কৃত্রিম প্রণালী লইয়া লাফালাফি ঝাপাঝাপি করিতেছে। যাহারা চারিটী বিবাহ করিয়া সংসার চালানো ধৰ্ম্ম-সঙ্গত জ্ঞান করে, সেই সম্প্রদায় কি এই সকল রীতিনীতি গ্রহণ করিবে? যেই সম্প্রদায়কে একটীর অধিক পাণিগ্রহণ করিতে আইনের দ্বারা নিষেধ করা হইয়াছে, তাহারাই পুনরায় এই পন্থার আশ্রয় লইয়া জনসৃজন রোধ করিবে। ভাবিয়া দেখ ব্যাপারটা কি চমৎকার! একসঙ্গে

চারিটী বিবাহ করিলে আইন যাহাকে আটকাইতে পারে না, সেই লোকটী চারিটী পত্নীকে নিয়া তোমাদের ক্লিনিকে হাজির হইবার সুযোগ গ্রহণ করিতে চাহিবে কি?

দেশ অন্নহীন, এই যুক্তিতে জন্ম-সংখ্যা হ্রাস প্রয়োজন। কেহ কিন্তু অকৃতদার ব্রহ্মচারী থাকিলে সভ্যতাভিমানীরা চোখ-টাটানি অনুভব করেন। অবিবাহিতেরা যে গৌণ ভাবে অন্নসমস্যাকে কিঞ্চিত শিথিল করিতেছে, একথা স্বীকার করিতে ইহাদের কুণ্ঠা। এরাজ্যে অবিবাহিতের নাকি বেশী আয়কর দিতে হয়। ইহাও কি তর্কশাস্ত্রের ধোঁকা নয়?

কৃত্রিম উপায়ে জন্ম-শাসনের ভিতরে মানুষের পশুত্বের প্রত্যক্ষ স্বীকৃতি রহিয়াছে। ইহার সহিত আমাদের আপোষ হইতে পারে না।

মানুষ মাত্রকেই স্বাবলম্বনের শক্তিতে নিজের এবং বহুজনের অন্ন অর্জ্জনের সামর্থ লাভ করিতে হইবে। ইহার উপরে জোর না দিয়া, তাহাকে জনন হ্রাস করিতেই হইবে, ইহার উপর জোর দেওয়া মূর্খতা।

চীনের সহিত যদি একশত বৎসর যুদ্ধ করিতে হয়, তবে কি জন্ম-নিরোধকারীরা সেই যুদ্ধে জয়ী হইবার সহায়তা করিবেন? যুদ্ধের নাম করিয়া মানুষকে কম খাইতে বলা হইতেছে। আবার, যুদ্ধের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপকরণ মানুষের সংখ্যা কমাইবার জন্য আন্দোলন চালান হইতেছে। স্বয়ং তর্কশাস্ত্রের প্রণেতাও বোধ হয় এমন লজিক জানিতেন না।

আমার নির্দ্দেশ এই যে, যতজন পার, আজীবন ব্রহ্মচারী থাক, জনসেবা কর। যে বিবাহ করিতে চাও, বিবাহ কর এবং বিবাহিত জীবনে সংযমের সাধনা কর। ভিক্ষান্নকে সর্ব্বতোভাবে বর্জ্জন কর এবং এই ভাবে জীবন যাপনের ফলে যে কয়টী পুত্র-কন্যা আসে,

একজনকেও অবাঞ্ছনীয় জ্ঞান না করিয়া প্রত্যেককে এমন ভাবে গড়িয়া তোল, যেন ইহারা জগতের বুকে দাগ রাখিয়া যাইতে পারে। প্রতিজ্ঞা কর, তোমাদের সন্তানেরা একজনেও যেন ক্লীবত্ব-প্রচারকারী কাপুরুষগুলির জয়ধ্বনি জীবনে একবারের জন্যও উচ্চারণ না করে। ভিক্ষালব্ধ স্বাধীনতা চরখা আর খদ্দরের আড়ালে আমাদিগকে যে অন্নে, বস্ত্রে, সংস্কারে, সংস্কৃতিতে, রুচিতে ও প্রকৃতিতে বিলাতী বানরে পরিণত করিতেছে, ইহা দেখিতে পাইতেছ না বলিয়াই আজ তোমাদের সতর্কতার প্রয়োজন সর্ব্বাপেক্ষা বেশী। মানুষের আবির্ভাবকে ভয়ের দৃষ্টিতে না দেখিয়া শিশুর জন্মকে ভরসার দৃষ্টিতে দেখিতে হইবে। মনে রাখিও, ইহাই আমাদের ভারতীয়ত্ব।

চাকুরীর দায়ে পড়িয়া অকারণে নারী ও পুরুষের গুপ্তাঙ্গ ঘাটিবার যে অপসুযোগ পাইয়াছ, তাহার অপব্যবহার করিও না। ধাত্রীবিদ্যা চর্চ্চা করিতে গিয়া অনেক ডাক্তারের পতন হইয়াছে। তোমার তাহা ঘটে নাই। সুতরাং বিলাতী পাপকে দেশের অর্থনৈতিক প্রয়োজন বলিয়া চালাইতে যাইবার সময়ে সেই মতিভ্রম তোমার হইবে না, ইহা আশা করি। নিখিল-বিশ্বকে ব্রহ্মময় দেখিবে। ব্রহ্ম ব্যতীত অপর কাহারও অস্তিত্ব অনুভব না করিবার জন্য সচেষ্ট থাকিবে। চাকুরীর দায় যতটুকু করিতে বাধ্য করে, তাহার একচুল আগে বাড়িবে না। চাকুরীর ভূত ঘাড় হইতে নামিলেই সঙ্গে সঙ্গে এই চর্চ্চা বর্জ্জন করিবে, এই প্রতিজ্ঞা কর।

রাষ্ট্রকর্ণধারেরা মজুতদারদের গুদামগুলি আবিষ্কার করিতে পারিলেন না। একদল লোক লুটিয়া-পুটিয়া খাইতেছে, অতি সঞ্চয় করিতেছে, অপচয় করিতেছে, ঘরে ঘরে অ্যালসেশিয়ান কুকুর পুষিয়া

মাসে একশত টাকা জলে ফেলিতেছে, আর অধিকাংশ লোক না খাইয়া পেটে পিঠে এক হইয়া যাইতেছে। এই অসামঞ্জস্য যেখানে প্রতিরুদ্ধ হইল না, সেখানে গরীব লোকের বুদ্ধি-ভ্রংশ ঘটাইবার পক্ষে কৃত্রিম ও কুরুচিপ্রণোদিত জন্ম-শাসন-আন্দোলনের চাইতে অধিক ফলপ্রসূ আর কি হইতে পারে? ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(১০)

হরি-ওঁ

মঙ্গলকুটীর

২১অগ্রহায়ণ, মঙ্গলবার, ১৩৭২

৭-১২-৬৫ ইং

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

গত চিঠির উত্তর পাইয়াছ পনর দিনে। আর তার পরের চিঠিতে উত্তর পাইতেছ সঙ্গে সঙ্গে। উত্তর ছয় মাসেও পাইতে পারিতে। কাজের এতই ভীড়। দুই একজনকে এক বৎসরে বা দুই বৎসরে উত্তর দিয়া আমি চমৎকৃত করিয়াছি। কিন্তু তোমার পত্র যেমন হাতে পড়া, সঙ্গে সঙ্গে জবাব।

এই আশ্বর্য্য ব্যপার কি করিয়া ঘটিল? গত চৌদ্দ দিন কুলী, কামিন, রাজমিস্ত্রী, সাধনা, আমি এবং আশ্রমের সকল কর্ম্মী এমন নিদারুণ পরিশ্রম করিয়াছি যে, আমরা যতটা ক্লান্ত হইয়াছি, তাহার অধিক ক্লান্ত হইয়াছি সেই কাজগুলি, যাহাদিগকে আমরা অশ্বারোহণে

পাকড়াও করিয়াছি। এই কয়দিনে এত অধিক কাজ হইয়াছে, যে কুলীদের আর হাত চলে না, কামিনদের আর পা চলে না। আমাদের প্রতিজনের সর্ব্বাঙ্গ ক্ষত-বিক্ষত ও ব্যথাহত হইয়া কর্ম্মের অগ্রগতিকে অভিনন্দন দিতেছে। প্রবাসী রাজমিস্ত্রীরা নিজেরাই গরজ করিয়া ছুটি চাহিল। অমনি ছুটি দিলে তাহারা বিরক্ত হয়। বারাণসী হইতে আসিয়াছে টাকা রোজগার করিতে, বিশ্রাম করিতে নহে। কুলী কামিনরা গেল মঙ্গলবারের হাট দেখিতে। কিছু কিনুক আর না কিনুক, হাটের জিনিষগুলা দেখিলেও আনন্দ। ট্রাকটী রিপেয়ার করিতে ধানবাদ দিয়াছি আজ চারি মাস। তদ্বির করিয়া ক্লান্ত হইয়া গিয়াছি। ট্রাক আর আসে না। সাধনা চলিয়া গিয়াছে ধানবাদ, ট্রাকটী আশ্রমে আনিবার চরম চেষ্টা করিতে। আশ্রম-কর্ম্মীরা বিষ্ণুকে ও অঞ্জনকে লইয়া পুরাতন আশ্রমে ধান মাড়াইতেছে। সুতরাং আজ আমার অফুরন্ত অবসর। পত্র পাওয়া মাত্র জবাব দিব না কেন?

তোমার সুদীর্ঘ পত্রে তোমার গ্রামের অবস্থা তুমি জানাইয়াছ। প্রায় সকল গ্রামেরই ইহাই অবস্থা। সহরগুলির অবস্থাই কি ইহার চাইতে পৃথক? সর্ব্বত্র শঠতা, প্রবঞ্চনা, পরস্বাপহরণ, মিথ্যাচার এবং জঘন্য অনৈতিকতা চলিতেছে।

তুমি সাহস করিয়া প্রতীকারে চেষ্টিত হইয়াছ জানিয়া সুখী হইলাম। মরণ পণ করিয়া ধৈর্য্য ধরিয়া যদি লাগিয়া থাক, কিছুকাল পরে দেখিবে, তোমার বহু সহকর্ম্মী মিলিয়া যাইতেছে। ইহারা সকলেই আমৃত্যু তোমার সঙ্গে থাকিবে না, থাকিতে পারে না,—ইহাদের শিক্ষা এবং চিরপোষিত সংস্কার ইহাদিগকে হঠাৎ সরাইয়া নিতে পারে। কিন্তু ততক্ষণে জগন্নাথের রথ চালু হইয়া যাইবে।

অনেকগুলি কাজ একসঙ্গে ধরিও না। একটা একটা করিয়া ধর। ডাক্তার কবিরাজেরা রোগী চিকিৎসা করিতে সবগুলি রোগলক্ষণ একসঙ্গে প্রশমনের জন্য ঔষধ দেন না, একটা দুইটা লক্ষণকে প্রধান মনে করিয়া আগে তাহার প্রতীকারক ঔষধের ব্যবস্থা করেন। ঐ একটী দুইটী উপসর্গ কিঞ্চিত কমিলে আর একটা দুইটা উপসর্গকে লক্ষ্য করিয়া ঔষধ দেন। এই ভাবে আস্তে আস্তে রোগী পূর্ণ আরোগ্য লাভ করে।

অন্যায়কে যে লোকে অন্যায় মনে করে না, অন্যায় করিয়া শাস্তির হাত এড়াইতে পারাকে যে লোকে একটা মস্তবড় বাহাদুরী বলিয়া জ্ঞান করে, আমার মতে ইহাই হইতেছে বর্ত্তমান সমাজ-ব্যাধির সব চাইতে বড় উপসর্গ। বিকার-রোগীর জ্বর কমাতে পারিলে ভুল-বকা আপনি কমিবে। ইতি –

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(১১)

হরিওঁ

মঙ্গলকুটীর

২রা পৌষ, শনিবার, ১৩৭২

১৮-১২-৬৫ ইং

কল্যাণীয়াসু ঃ—

স্নেহের মা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

পুপুন্‌কীতে এখন মালটিভারসিটি বা বিশ্ববিদ্যাকেন্দ্রের নির্ম্মাণ-কার্য্য আমাদের শক্তি ও সাধ্যের হিসাবে দুরন্ত বেগে চলিতেছে।

শরীরের আমার পূর্ণ বিশ্রাম নেওয়া প্রয়োজন। একটুকু যে সুস্থ হইয়াছি, তাহার সুযোগ গ্রহণ করিয়া কঠোর বিশ্রামের দ্বারা আমার সম্পূর্ণরূপে সুস্থ হওয়া প্রয়োজন। কিন্তু ঘটনাবলী তার অনুকূলে নহে। সুতরাং আমাকে খাটিতে হইতেছে। আমি এতই শ্রমলিপ্ত যে, নিতান্ত জরুরী পত্রগুলিও অবহেলিত হইয়া পড়িয়া আছে। শেষ রাত্রে উঠিয়া চিঠি লিখি। আটটা বাজিতেই মাঠে বাহির হইয়া যাই। কোন কোন দিন ঘরে ফিরিতে রাত্রি হইয়া যায়। সারাদিন স্নান করিবার ফুরসৎটুকু মিলে না। রাত্রে আবার লেখনী ধরি। যতক্ষণ উদর দারুণ ক্ষুধায় উৎপীড়িত না হয় বা নিদ্রায় চক্ষু আচ্ছন্ন হইয়া না যায়, ততক্ষণ চিঠি লিখি। তবু তোমরা শতকরা দুই তিনজনের বেশী আমার পত্র পাও না। দুঃখ তোমরা করিতে পার কিন্তু এক্ষেত্রে আমি একেবারে নিরুপায়।

তুমি তোমার ছেলের কথা লিখিয়াছ। ছেলে শাসন মানে না, কথা শোনে না, পড়ায় বসে না। সত্যই ইহা পরিতাপের বিষয়। কিন্তু তুমি ইহার প্রতীকারের যে পন্থা আবিষ্কার করিয়াছ, ইহা মারাত্মক। ছেলেকে বিদেশে পাঠাইবে, বোর্ডিংএ রাখিবে, অচেনা লোকের মধ্যে আর দুষ্টামি শয়তানি করিবে না, ইহা তোমার দারুণ ভ্রম। অচেনা লোককে চেনা করিয়া লইতে তাহার কয়দিন লাগিবে? অচেনা জায়গা তাহার চেনা হইতে কয় সপ্তাহের প্রয়োজন হইবে? অনেচা জায়গা, অচেনা লোক পরিচিত হইয়া যাইবার পরে, যে দৌরাত্ম্য সে ঘরে বসিয়া করিত, সেই দৌরাত্ম্য সে বিদেশে গিয়াও করিবে। হয়ত সেখানে আরও নূতন কিছু দুষ্টামি শিখিবে, যাহার তোমরা কল্পনাও করিতে পার না।

আসল কথা এই যে, তোমরা পুত্রকন্যার জন্মদানই করিয়াছ,

পিতা বা মাতা হইতে পার নাই। পুত্রকে বা কন্যাকে ছোটকাল হইতেই উচ্চপ্রেরণা দিতে হয়, সর্ব্বজীবে ভালবাসা শিখাইতে হয়, দেশ, জাতি, সমাজ ও জগতের উপর যে দায়িত্ব আছে, কর্ত্তব্য আছে, তাহা বুঝাইয়া দিতে হয়। ত্যাগ, নিঃস্বার্থপরতা, নিষ্কামতা ও বদান্যতার অনুশীলন করাইতে হয়। তোমরা জন্মাবধি পুত্রকন্যাদিগকে শিক্ষা দিতেছ ইহার বিপরীত। সুখ আর স্বার্থ এই দুইটী কথা ছাড়া অন্য কোনও কথা ইহাদের কর্ণে প্রবেশ করে নাই। ইহারা জীবনে কোনও উচ্চ প্রেরণা পাইল না, উচ্চাদর্শের খোঁজ লইল না, মনুষ্যত্বের অভ্রভেদী মহনীয়তা সম্পর্কে কোনও ধারণার ধার ধারিল না, আর তোমরা প্রত্যাশা করিয়া বসিলে যে, বিদেশে এক ছাত্রাবাসে পাঠাইয়া মাসে মাসে খরচের টাকা পাঠাইলেই ছেলে মানুষ হইয়া ফিরিয়া আসিবে। বনমানুষ বা অমানুষ হইয়া ফিরিবার সম্ভাবনাই যে বেশই, এই কথাটা তোমরা চিন্তা কর নাই।

অতীতে তোমরা ভুল ভ্রান্তি যাহাই করিয়া থাক, এখন তাহার দ্রুত সংশোধন কর। পুত্রকন্যাকে নিজ হাতে মানুষ করিবার দায়িত্ব অবিলম্বে গ্রহণ কর। জিদ করিয়া বস যে, অবাধ্য পুত্রকে বিনীত, নম্র এবং আজ্ঞাবহ করিবেই করিবে, নিমেষের জন্যেও আত্ম-অবিশ্বাস করিও না। তোমরা দলে দলে ঘরে ঘরে পুত্রকন্যার সৃষ্টি করিবে, আর একদল লোক জীবিকার জন্য বিদ্যালয়ে বিদ্যালয়ে মাষ্টারী করিবে, যে বিদ্যালয়ে বেতন কম, তাহা ছাড়িয়া ক'দিন পরেই বেশী বেতনের লোভে অন্য বিদ্যালয়ে হাজির হইবে, স্কুল বদলের সঙ্গে সঙ্গে ছাত্র বদল করিবে এবং পুরাতন ছাত্রদের কথা ভুলিয়া যাইবে,—ইহা মানুষ গড়িবার অনুকূল রীতি নহে। ছাত্রকে গুরুগৃহে পাঠান প্রাচীন সংস্কার।

এমন কি বশিষ্ঠ-বাল্মিকীর তুল্য ঋষিরাও নিজ পুত্রদিগকে সকল সময়ে নিজের ঘরে পড়াইতেন না কিন্তু শৈশবেই তাঁহারা মানুষ-গড়া সুরু করিতেন। বীজের অঙ্কুরোদ্গম পিতা-মাতারই সংসারোদ্যানে ঘটিত। অনেক ক্ষেত্রে পিতা নিজেই গুরু হইতেন। জ্ঞানদানের চাইতে বড় দান নাই কিন্তু পিতামাতাকে অগ্রাহী কুপুত্রের বদলে সুগ্রাহী সুপুত্র গড়িয়া লইতে হইবে। পিতামাতার দায়িত্ব শিক্ষাদাতার দায়িত্ব অপেক্ষা কম নহে। সেই দায়িত্ব আরও বাড়িয়া গিয়াছে এই জন্য যে, মানুষ গড়িবার জন্য উন্মত্ত শিক্ষক প্রায়ই নাই। অধিকাংশেই যে-কোন প্রকারে জীবিকার্জ্জনের জন্যে মাষ্টারী নিয়া থাকেন। বিশ্বাস করিয়া ঠিকাদারের হাতে বাড়ী তৈরীর ভার দিলে। চূণ, বালি, সিমেন্ট সবই দিলে। সে যদি এই সকল উপকরণের সদ্ব্যবহার না করে, কাদা দিয়া দেওয়াল গাথিয়া যদি বাহিরে কড়া প্লাষ্টারিং করিয়া দেয়, সে চাতুরী বা অবহেলা তুমি কি করিয়া ধরিতে পার, নিজের ছেলেকে নিজেই গড়।

মানুষ গড়িবার জন্য পাগল হইয়া যাহারা অর্দ্ধ-শতাব্দী ধরিয়া আয়ুক্ষয় করিতেছে, তাহাদিগকে কবে তোমরা উপযুক্ত সহযোগ দিয়াছ? ঘটা করিয়া উৎসব-সমারোহ করিতে না পারিলে তোমরা ত্যাগীর জীবনের মর্ম্মকথা বুঝিতে পার না। জাতি গড়িয়া উঠিবে নীরবে নিভৃতে,—হঠাৎ যেদিন আত্মপ্রকাশ করিবে, সমগ্র বিশ্ব বিস্মিত হইবে, স্তম্ভিত হইবে। কিন্তু গতানুগতিক-পন্থী মৌলিক-চিন্তাবর্জ্জিত পরাণুকরণকেই চিরকাল পৃষ্ঠপোষণ করিয়াছ। তোমাদের পক্ষে বাহিরের শিক্ষকের উপর নির্ভর করা উচিত নহে। নিজের ছেলে নিজেই গড়িবে এই পণ কর। পরীক্ষা পাশ করাইবার জন্য টিউটর রাখিতে পার কিন্তু চরিত্র গঠনের ভার যার তার উপরে দিও না। প্রত্যেকটি

বংশেই কোনও না কোনও সদ্‌গুণ থাকে। সেই বিশিষ্ট সদ্‌গুণটির অনুকূলে আরও দশ পাঁচটী সদ্‌গুণকে বিকশিত করিয়া তুলিবার নামই শিক্ষাদান। এই সংজ্ঞাটী তোমরা ভুলিও না। তাহা হইলে বুঝিতে পারিবে যে, শিক্ষাদানের প্রাথমিক এবং মৌলিক দায়িত্ব কেন পিতা-মাতার উপরেই আসিয়া পড়ে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(১২)

হরি-ওঁ

মঙ্গলকুটীর

৬ পৌষ বুধবার, ১৩৭২

২২-১২-৬৫ ইং

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও। একবার মঙ্গলকুটীরের ত্রিতলে ছুটিতেছি রাজমিস্ত্রীদিগকে কাজের নির্দ্দেশ দিবার জন্য, একবার মঙ্গলবাঁধের উপরে বিস্তীর্ণ ছাত্রাবাসের দেওয়াল-নির্ম্মাণ কাজ দেখিবার জন্য নামিয়া আসিতেছি নীচে, একবার ছুটিতেছি মাটিয়ালরা মঙ্গলসাগরের গভীরতা বৃদ্ধি করিবার জন্য কাজে লাগিয়াছে, তাহা দেখিতে। এ এক বিচিত্র কর্ম্ম-চাঞ্চল্য। ইহার মধ্যে পত্রলিখন-কর্ত্তব্য সুচারুরূপে সমাধা সম্ভব নহে। এইজন্যই তোমাদের অনেককে সাম্প্রতিক একটী জরুরী সংবাদ মোটেই দেওয়া হয় নাই। তাহা এই যে, হোজাইতে নিখিল-ভারত-অখণ্ড-মহাসম্মেলনের যে অধিবেশন হইবে, তাহাতে প্রতিনিধিস্থানীয় লোকদের উপস্থিত হইতে হইবে।

একমাত্র স্নেহময় সম্ভবতঃ প্রতিধ্বনির মাধ্যমে এই সংবাদটি প্রচার করিয়া থাকিবে। তাহা হইলে সকলেই তোমরা সংবাদটি জানিতে পারিবে।

সম্মেলন আদিতে যোগ দেওয়ার তাৎপর্য্য এই নহে যে, অনেক কথা শুনিলে এবং অনেক কথা বলিলে অথবা অপরিচিতেরা পরস্পর পরিচিত হইলে। সম্মেলনে মিলিত হইবার একমাত্র উদ্দেশ্য হইতেছে সকলে মিলিয়া একই সময়ে, একই উদ্দেশ্যে, পূর্ণ শক্তি লইয়া কাজে লাগিয়া যাওয়ার চেষ্টা করা। নতুবা সম্মেলন প্রকৃত প্রস্তাবে অর্থের অপচয়, সময়ের অপব্যবহার এবং অকারণ পথক্লেশ-স্বীকার।

এই কথা মনে রাখিয়া যাহারা হোজাইতে আগামী ১০ই বৈশাখ নিখিল-ভারত-অখণ্ড-মহাসম্মেলনে যোগদান করিতে আসিবে, তাহারা পৃথিবীতে এক নতুন ইতিহাস সৃষ্টি করিতে সমর্থ হইবে। জগতে সাধারণ ঘটনার দ্বারাই অসাধারণ ইতিহাস সৃষ্টি করা হয়, সহস্র সহস্র সাধারণ লোকের ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টার সাফল্যই ইতিহাসের মূর্ত্তি লয়, যাহা সাধারণভাবে আরব্ধ হইয়াছিল, তাহাই ধারাবাহিক প্রযত্নপরায়ণতার প্রভাবে জগতের ইতিহাস-সমুদ্রের দিক-প্রদর্শনকারী আলোকস্তম্ভ হইয়া থাকে। তোমরা সাধারণ মানুষকে বিশ্বাস করিও। তোমরা সাধারণ কাজকে বিশ্বাস করিও। তোমরা সাধারণ নীতিকে সম্মান দিও। মানুষের সাধারণ কাণ্ডজ্ঞান হইতেই অসাধারণ প্রতিভার উন্মেষ ঘটিয়া থাকে।

যাহা ধরিব, তাহা ছাড়িব না। এই সঙ্কল্পের নাম পণ। তোমরা পণবদ্ধ হইয়া প্রত্যেকে কাজে লাগো। সমস্ত পৃথিবী যদি তোমাদের প্রতি বিরূপ হইয়া যায়, তাহা হইলে তুমি বা তোমরা একক ভাবে বা অল্প কয়েকজনে সম্মিলিত ভাবে নিজেদের ব্রত সিদ্ধির জন্য

আমৃত্যু লাগিয়া থাকিবে, এই জিদ কর। জিদ না করিলে জিৎ হয় না। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(১৩)

হরি-ওঁ

১৭ই পৌষ, ১৩৭২
২/১/৬৬ ইং

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিষ জানিও।

বারাণসীর উৎসব আর দুইটী দিন পরেই উদযাপিত হইয়া যাইবে। এতদিন বিগ্রহ আমাদের বাসগৃহের মধ্যে ছিলেন। এখন নূতন করিয়া রৌপ্য-নির্মিত বিগ্রহ নূতন ঠাকুর-মন্দিরে উঠিলেন। এই উপলক্ষ্যে যে উৎসব হইয়াছে, তাহাতে কাশীধামের উদারমতাবলম্বী এবং সনাতনপন্থী সর্ব্ববিধ ঈশ্বর-বিশ্বাসীদের পূর্ণ এবং হৃদয়িক সমর্থন আসিয়াছে। উৎসব আমরা খোলা মনে, খোলা প্রাণে, নিঃশঙ্কে, নির্ভয়ে, অনুৎকণ্ঠিত চিত্তে করিয়াছি। নূতন বিগ্রহ নূতন মন্দির উজ্জ্বল করিয়াছেন। এতগুলি সমাগত নরনারীর যোগ্যভাবে প্রসাদ গ্রহণে কোনও ত্রুটি ঘটে নাই। এককণা অর্থাভাব হয় নাই। উৎসবাগতেরা তিন চারি পাঁচ দিন ধরিয়া আশ্রমে অবস্থান করিয়াছেন। কিন্তু কাহারো মুখে বা মনে অভিযোগের রেখা ফুটিতে দেখি নাই। এগুলি সবই পরমেশ্বরের প্রেমময় লীলা। গতবার পুপুন্‌কী উৎসবে যোগ দিতে আসিয়া কতজনে কত ক্লেশ পাইয়াছ, কত অসুবিধা ভুগিয়াছ। এবার

ভগবান আমার সেই আফশোষ মিটাইয়াছেন। পুপুন্‌কীতে পুনরায় উৎসব করিব সেইদিন, যেইদিন দশহাজার প্রতিনিধির মাথার উপরে আচ্ছাদন দিতে পারিব। সেই উদ্দেশ্যেই পুপুন্‌কীর কাজ দুরন্ত দ্রুততায় অবিরাম অবিশ্রাম চালাইয়া যাইতেছি।

লিখিয়াছ, আমার জন্মোৎসবই তোমাদের বৎসরের সব চাইতে বড় উৎসব। মালটিভারসিটির দিকে তাকাইয়া আমি তাহা সর্ব্বত্রই খর্ব্ব করিয়া দিয়াছি বলিয়া তোমাদের সকলেরই মনে বড় কষ্ট হইয়াছে। এই কষ্ট তোমাদের প্রাণের অন্তহীন প্রেমেরই পরিচায়ক। মালটিভারসিটির কাজ একবার গুছাইতে পারিলে তোমরা অনন্তকাল ধরিয়া মহাড়ম্বর সহকারে আমার জন্মোৎসব করিতে পারিবে। আমি সাধারণ প্রতিভার অধিকারী হইয়া মালটিভারসিটির কার্য্যে হস্তক্ষেপ করি নাই। জন্মোৎসবের দিন উপাসনান্তে আমি আমার সংস্কৃত ভাষণে বলিয়াছিলাম যে,—"কিং একলা মুক্তিঃ মুক্তিরেব ভবতি? কিং একলো মোক্ষঃ মোক্ষঃ-সংজ্ঞা-লাভায় সমর্থঃ? যদি সর্ব্বেষাং মুক্তির্ন ভবতি, ন ময়া তদা মোক্ষঃ প্রার্থতে, ন মুক্তিস্তদা ময়া সুকাম্যা। একক মুক্তির কি কোন অর্থ হয়? একক মোক্ষকে কি মোক্ষ নাম দিতে হইবে? যদি সকলকে লইয়া মুক্তির আস্বাদ গ্রহণ করিতে না পারি, তাহা হইলে তাহা আমার প্রার্থনীয় নহে। যেনাহং সর্বৈঃ সমন্বিতো ন স্যাম্ তেনাহং কিং কুর্য্যাম্। সকলকে লইয়া একাত্ম যদি না হইতে পারি, তবে মুক্তির আমার কি প্রয়োজন?" আমি বলিয়াছিলাম—"অন্তরের সাকল্য মুক্তি-কামনা অর্থাৎ একক মুক্তি-বিমুখতা আমাকে সর্ব্বমন্ত্রের সমন্বয়, সর্ব্বমন্ত্রের সাকল্য বিগ্রহ, সর্ব্বমন্ত্রের সমুচ্চয় ও সমষ্টি স্বরূপ প্রণবোপাসনার দিকে ধাবিত করিয়াছে। নায়ং লোকসংস্কার যো মাং

ধাবয়তি প্রণবোপাসনায়ৈ পরন্তু সংহতিবদ্ধ মুক্তি-কামনা আমাকে সেই সামুহিক উপাসনায় প্রেরিত করিয়াছে, জগতের যাবতীয় মন্ত্রের সমষ্টি স্বরূপ যাঁহার আলম্বন। সমুপস্থিত বিবুধ-মণ্ডলী সামূহিক মুক্তিকামনার সহিত সমবেত উপাসনার দার্শনিক ঘনিষ্ঠতার এই স্বাভাবিকতা লক্ষ্য করিয়া চমৎকৃত হইয়াছেন। ইহার পশ্চাতে যেমন একটা অদ্ভুত পরিকল্পনা লক্ষ্য করা যাইতেছে, যেই পরিকল্পনার প্রসারে হইতেছে তাঁহারই কাছ হইতে, ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ, আমাদের বুদ্ধিবৃত্তি সমূহকে যিনি পরিচালনা করিতেছেন, মালটিভারসিটির পরিকল্পনাকেও তোমরা তদ্রূপ জ্ঞান করিও। মনগড়া যোগবিয়োগের হিসাব নিকাশ করিয়া মালটিভারসিটির পরিকল্পনা করি নাই। জাতির অতীত আয়োজন, জাতির বর্ত্তমান প্রয়োজন এবং জাতির ভবিষ্যৎ সংযোজন, এই তিনটির মধ্যে ঘনিষ্ঠ সংযোগ রাখিয়া মালটিভারসিটির পরিকল্পনা আপনা আপনি রচিত হইয়া উঠিয়াছে। যে গর্ত্তটা ত্রিশ বছর পূর্ব্বে খুঁড়িয়াছি, আজ সেখানে কংক্রীট ঢালিয়া র‍্যামিং মেসিন চালাইতেছি। ক্ষুদ্র একটী বালুর রেখা যে মাটির উপরে পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে চিহ্ন বুলাইয়া গিয়াছে, আজ সেখানে ট্রাক চলিবার বিশফুট প্রশস্ত রাস্তা হইতেছে। মাষ্টারপ্ল্যান ইংরেজী ১৯২৭, বাংলা ১৩৩৪ সালেই তৈরী হইয়া গিয়াছিল। উনচল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে যে বাক্যগুলি উন্মত্তের প্রলাপের মতন শ্রুত হইয়াছিল আজ সেগুলি অক্ষরে অক্ষরে সত্য হইয়া রূপ ধারণ করিতেছে। মালটিভারসিটি কাঁচা হিসাবের কাজ নহে। ভগবান নিজে বসিয়া ইহার পাকা হিসাব লিখিয়াছেন। নতুবা তোমরা কি কখনও শুনিয়াছ যে, ভারতবর্ষের কোন লোক উনচল্লিশ বছর ধরিয়া একটা লক্ষ্যে কৃচ্ছ্র-সাধন করে? আমরা উপবাস করিবার দিনগুলিকে

একত্রে জুড়িলে কয় বৎসর হয়, তোমরা ধারণা করিতে পারিবে? কিন্তু নিমেষের জন্য কি বিশ্বাস হারাইয়াছি? তোমরা আমার জন্মোৎসব মহাসমারোহে করিতে পারিলে না, কৃপণ হইতে হইল, খরচ বাঁচাইতে হইল, মনের দুঃখে স্নিয়মান হইতেছ। কিন্তু আমাকে বিশ্বাস কর, আমি তোমাদের মনের ব্যথা ঘুচাইবে। ভবিষ্যতের লক্ষ লক্ষ মানব-মানবীর মুখে হাসি ফুটাইব বলিয়াই ত' তোমাদিগকে এই দুঃখ দিলাম। সকলের মনকে এখন মালটিভারসিটির অভিমুখী কর। ইহার চাইতে মহত্তর কাজ এখন তোমাদের আর কিছু নাই। দুয়ারে দুয়ারে কি ভিক্ষা মাগিয়া তোমরা মালটিভারসিটির টাকা তুলিবে? কদাচ নহে। তোমরা তুচ্ছ, তোমরা গরীব আর তোমাদের স্বতঃ প্রবৃত্ত ত্যাগের মধ্য দিয়াই স্বাবলম্বনের বিশ্ববিদ্যাকেন্দ্র ধীরে ধীরে মস্তক উত্তোলন করিবে। আমি এক একখানা করিয়া ইট গাঁথি আর আকাশের পানে তাকাই, চাহিয়া দেখি, আকাশের অভ্র কত দূরে। ঈশ্বরের সৃষ্টি হিমাচল, তোমাদের সৃষ্টি মালটিভারসিটি। এ দুই কখনও দাতার দুয়ারে মাথা নত করিবে না। এখানে তোমরা গড়িয়া তুলিবে স্বাবলম্বীন দল। নির্ভয়ে যারা জগৎ জুড়িয়া চালাইবে অভিযান সত্য, ধর্ম্ম, ন্যায় ও চরিত্রের। ভিক্ষাটনের প্রচলিত রীতি তোমরা অনুসরন করিতে পার না।

৫ই জানুয়ারী বারাণসী ছাড়িব, ৬ই পৌছিব পুপুন্‌কী, এই ছিল প্রচারিত কর্ম্মসূচী। পায়ে একটা কার্ব্বাঙ্কল লইয়া বারাণসীর উৎসবে খাটিতে খাটিতে বেচারী প্রেমাঞ্জন একেবারে নাজেহাল হইয়াছে। ভ্রমন-সূচী সাতদিন পিছাইতে হইল। ইহার অর্থ এই যে, পুপুন্‌কীর কাজ এই সাতদিন ঢিমা-তেতালায় চলিবে। ভাবিয়া দেখ, একটা ভাল কর্ম্মীর

শরীর অসুস্থ হইলে কাজের কত ক্ষতি হয়। সুতরাং কর্ম্মীদের যাতে স্বাস্থ্য ভাল থাকে, ইহা দেখা সকলেরই কর্ত্তব্য। কিন্তু কয়েকটা জেলা হইতে ভ্রমণ-তালিকা করিবার জন্য বড় জোর তাগিদ আসিতেছে। ইহারা জানে, আমি যাইতে পারিব না। পুপুন্‌কীর গুরুতর কাজ ফেলিয়া যাইতে পারি না। স্বাস্থ্যের দিকে তাকাইয়াও যাওয়া সঙ্গত নহে। তবু, শুধু লিখিতেছে,—"আসুন বাবা আসুন।" ইহার এক কারণ, আমার প্রতি অতিশয় প্রীতি। অপর কারণ নিজেদের শক্তি সম্পর্কে অজ্ঞতা। তোমরা যদি নিজ নিজ স্থানে অখণ্ড-সংহিতা লইয়া ঘরে ঘরে কাজে নামিয়া যাও, তোমরা যদি দলাদলি ছাড়িয়া দাও আর গলাগলি করিয়া কাজে নামো, অন্তরভরা প্রেম লইয়া, বক্ষোভরা সাহস লইয়া, নয়নভরা আশার দীপ্তি লইয়া আর, গালভরা হাসি লইয়া যদি অখণ্ড-সংহিতার অভিযান চালাইতে থাক, এমন কোন্ অসম্ভব ব্যাপার আছে, যাহা তোমরা ঘটাইতে পারিবে না? স্থূল শরীরে আমি তোমাদের মধ্যে আসিতে পারি নাই বলিয়াই ত' আমার বাঙ্ময়ী তনু অখণ্ড-সংহিতা তোমাদের ঘরে ঘরে বহন করিয়া লইয়া যাওয়া উচিত। এই জীবনে কোন্ কথাটা আমি নিজের জন্য কহিয়াছি? কোন্ কথাটাই বা নিজের জন্য ভাবিয়াছি? যখন যাহা ভাবিয়াছি বা কহিয়াছি, সকলেরই জন্য ভাবিয়াছি বা কহিয়াছি। আমার নিজের ভাবনা যখন আমাকে ব্যাকুল করিয়াছে, তখনও সকলের ভাবনাই উহার আসল প্রেরয়িত্রী। আমাকে যাঁহারা আদর করিবেন বলিয়া বিশ্বাস কর, আমার বাণীকে তাঁহারা অনাদর করিবেন বলিয়া কেন তোমাদের সংশয়? কেন তোমরা আত্মবিশ্বাসে এত দীন? সর্ব্বত্র আমার শরীর যাইতে পারে না কিন্তু বাণী সর্ব্বত্র পৌছাইতে পারে।

আমার বাণী আর আমার জীবন কি আলাদা? শতকণ্ঠে, সহস্রকণ্ঠে তোমরা আমার সুরে সুর মিলাও। আমার তানে তান ধরিয়া জগদ্ব্যাপী ঐক্যগান তোমরা আরম্ভ কর। যে আছে যেখানে ছোট কিম্বা বড়, সকলেরে কাছে টানিয়া লও। যত দূর আর যত পর আছে, সবার নিকট আপন হও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(১৪)

হরি-ওঁ

বারাণসী

বুধবার, ২০ পৌষ, ১৩৭২

৫।১।৬৬ ইং

কল্যাণীয়েষুঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তুমি মানুষ, ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। তাই, তুমি আমর স্বাভাবিক স্নেহের অধিকারী।

তুমি একজন মহাসাধকের পুত্র এবং পরম তপস্বী গুরুর শিষ্য। এই জন্য তুমি আমার আরও প্রিয়। জগতে যেখানে যে মহাপুরুষ জগতের কল্যাণের জন্য যাহা কিছু করিতেছেন, তাহার দ্বারা তিনি আমার আপনার আপন হইতেছেন। কোটি কোটি বিশ্ব লইয়া আমার সংসার। সেই সংসার-হর্ম্ম্যের স্তম্ভ বলিয়া আমি এই মহাপুরুষদিগকে সম্মান করি। তাঁহাদেরই একজনের তুমি শিষ্য। তুমি আমার প্রিয় হইবে না ত' কে হইবে?

নিখিল বিশ্ব জুড়িয়া আমি আমার পরিকল্পনার মায়াজাল ছড়াইয়া

রাখিয়াছি। ইহা অলীক বলিয়া মায়া নহে, সত্য হইয়াও মায়া। এই জালের গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে প্রেমের মোহন বংশী ধ্বনিত হইতেছে। তাহাতে আমি প্রত্যেকটী দম্পতীকে শিব-পার্ব্বতী জ্ঞান করিয়া সর্ব্ববিঘ্নবিনাশন গণেশ, সর্ব্বশত্রুনিশাদন কার্ত্তিকেয়, সর্ব্বদৈন্য-বিদূরিকা লক্ষ্মী এবং অজ্ঞান-তমসা-নাশিকা সরস্বতীর আবির্ভাব কামনা করিতেছি। তুমি তাঁহাদেরই কাহারো সন্তান। কেন তোমাকে ভালবাসিব না?

তোমার ওখানে তোমার আশ্রমটীর উদ্বোধনে যাইতে লিখিয়াছ। কিন্তু আমার পক্ষে এখন যাওয়া ত' সম্ভব নহে। ভগবানকে উদ্বোদ্ধা করিয়া ভগবানের পরমমঙ্গলময় নাম লইয়া আশ্রম-প্রতিষ্ঠা কর। মঙ্গলময় তোমার কুশল করুন।

অখণ্ড-সংহিতা বিতরণ করিবার মতন এখন ভাণ্ডারে নাই। তাই, অখণ্ড-সংহিতা বিনামূল্যে দেওয়া যাইবে না। তবে, প্রতিধ্বনি তোমাকে পাঠাইবার জন্য তোমাকে নিঃশুল্ক গ্রাহক তালিকার অন্তর্ভুক্ত করিলাম। এখন হইতে চৈত্র পর্য্যন্ত পাইবে।

একজন হয়ত প্রতিধ্বনি কিনিতে পারে না। কারণ টাকা নাই। কিন্তু পাঁচ জন গ্রাহকের টাকা সংগ্রহ করিয়া একসঙ্গে বারাণসীতে স্নেহময়ের নিকটে পাঠাইলে সে তাহার স্বোপার্জ্জিত বিত্তরূপে বিনামূল্যে এক বৎসরের পত্রিকা পাইতে পারে। এই চেষ্টায় একটা আত্মপ্রসাদও আছে। ইহাতে ভিক্ষার গ্লানি নাই, যাচকতার দৈন্য নাই, অপরের অনুগ্রহ-বিগ্রহের অপেক্ষা নাই। ইহাতে আছে আত্মসম্মানের গৌরব, স্বোপার্জ্জনের কৃতিত্ব, আত্মশক্তি-প্রয়োগ-চেষ্টার মহত্ত্ব। ইহাতে কেন তোমরা বিমুখ হও? আমি ত' কয়েকটা নামজাদা সংঘ, মিশন

এবং আশ্রমের প্রায় পঞ্চাশটী শাখা-প্রতিষ্ঠানে বছরের পর বছর বিনামূল্যে প্রতিধ্বনি পাঠাইবার ব্যবস্থা করিয়াছি। ইহারা প্রত্যেকেই প্রার্থনা জানাইয়া নিঃশুল্ক পত্রিকা পাইতেছেন। কিন্তু কাহারও মধ্যে বৈধ দাবী রূপে পাইবার চেষ্টার কোনও ঈঙ্গিতমাত্র দেখিতেছি না। আমার মতে ইহা জাতীয় জীবনে ক্ষয়ের লক্ষণ।

আমি তোমাকে তিরস্কার করিতেছি না, উপদেশ দিলাম মাত্র। কেহ চাহিলে যতক্ষণ পারা যায়, বিনামূল্যে দিতে হইবে বৈ কি! পাঁচ জনে যদি তাঁহার ওখানে পত্রিকাখানা পড়ে, তাতে দেশের উপকার। কিন্তু তাঁহার নিজ চেষ্টার মহিমায় বৈধ উপার্জ্জন রূপে যদি উহা তাঁহার ওখানে যায়, তবে জিনিষটারও মূল্য বাড়িবে, পাঠকের নিকটও পত্রিকাখানা বা তাহার বাণীগুলির ইজ্জত বাড়িবে। স্বাবলম্বনকে আমি জাতির অভ্যুদয়ের মূলমন্ত্র বলিয়া জানিয়াছি। কোনও ব্যাক্তি বা সংঘের ভিতরে স্বাবলম্বন দেখিলে আমি উল্লাস অনুভব করি। এমন দিন এদেশে অবশ্যই আসিবে, যখন স্বাবলম্বনের প্রতি প্রত্যেক মানুষ এবং প্রত্যেক সংঘ শ্রদ্ধান্বিত হইবেন।

ভিক্ষা করিলে, চাঁদা তুলিলে, বারংবার জনসাধারণের কাছে যাইয়া নিজেদের সদুদ্দেশ্য জানাইয়া আবেদন-নিবেদন করিলে, অপরের কষ্টলব্ধ অর্জ্জিত অর্থের কতকাংশ অনায়াসে পাওয়া যায় বলিয়াই দিকে দিকে শত শত আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হইতেছে। দানের পুণ্য সম্পর্কে অধিকাংশ মানুষের মনে ধর্ম্মীয় সংস্কার থাকার দরুণ, দানগ্রহীতা নিজচরিত্রে বা আদর্শবাদে কোনও মহত্ত্বের রেখাপাত করিতে সমর্থ হইলে, বিপুল অর্থরাশি সেখানে আসিয়া পুঞ্জিত হইতেছে। দানগ্রহীতার ভিতরে এই সকল সদ্‌গুণের সমাবেশ না থাকিলেও প্রার্থীকে বিমুখ করিতে কাহারো

সংস্কারজ ভীতি আসে, কাহারো বা লোকলজ্জা জন্মে। সুতরাং অধ্যবসায়রূপ গুণটি থাকিলে নিতান্ত অপাত্রেরাও যথেষ্ট অর্থ সংগ্রহ করিতে পারে। অর্থনৈতিক অবস্থা দেশের যতই খারাপ হউক, উল্লিখিত মনস্তাত্ত্বিক কারণ সমূহের আনুকূল্য হেতু দিনের পর দিন দেশের মধ্যে আশ্রম সংখ্যা বাড়িয়া যাইতেছে। আশ্রমাদি সৎপ্রতিষ্ঠানের সংখ্যা-বৃদ্ধিতে কে না আনন্দিত হইবে? কিন্তু আশ্রম সংখ্যা ত' বাড়িল, সঙ্গে সঙ্গে জাতির শৌর্য্য, বীর্য্য, সামর্থ্য, সাহস এবং কর্ম্মোদ্যম বাড়িল কিনা, ইহাও ত' বিচার করিবার বিষয়। স্বাবলম্বন শৌর্য্য-বৃদ্ধির অনুকূল। এই জন্যই আমি স্বাবলম্বনের রাস্তা ধরিয়াছি। অন্য কোনও প্রতিষ্ঠানকে হেয় করিবার জন্য নহে, আমার দেশ ও জাতিকে বলবান না করিতে পারিলে আমরা বিশ্বশান্তির অন্তরায় হইব,—এই জন্য।

একথাগুলি তিরস্কারের জন্য লিখিতেছি না বাবা, উপদেশের জন্য।

আমার স্বাবলম্বন যদি অন্যান্য সংঘের প্রতি আমাকে বিদ্বিষ্ট বা ঈর্ষ্যান্বিত করিত, তাহা হইলে ইহা অপরাধ হইত। প্রেমহীন সংসারে নূতন ধর্ম্ম নূতন কর্ম্মপন্থা প্রচারণের প্রসারণের একমাত্র উদ্দেশ্য হইবে প্রেমের প্রতিষ্ঠা। মানুষ মানুষকে প্রাপ্য স্নেহ-ভালবাসা হইতে বঞ্চিত করিয়াছে,—ইহাই বর্ত্তমান জগতের জটিলতম ব্যাধি। যে-ই যাহা করি, হৃদয়-মন প্রেমরসে আপ্লুত করিয়া করিব, ইহাই আমাদের লক্ষ্য হউক। আমার অভিক্ষার বৈজয়ন্তী ভিক্ষাটনকারীদের বিরুদ্ধে দ্বেষঘোষণা নহে। এস, আমরা এমন এক পবিত্র সমন্বয়মঞ্চে আসিয়া মিলিত হই, যেখানকার একমাত্র দৃশ্য প্রেম, একমাত্র আকর্ষণ প্রেম, একমাত্র সৌষ্ঠব প্রেম, একমাত্র গৌরব প্রেম। সর্ব্বজীবে প্রেমের

ঐক্যবন্ধনের মধ্যখানে যদি ধর্ম্মের বা ঈশ্বরের দোহাই কোনও ব্যবধান সৃষ্টি করিতে আসে, বুঝিতে হইবে আমাদের ধর্ম্ম বা ঈশ্বর-সম্পর্কিত ধারণা ভ্রান্ত। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(১৫)

হরি-ওঁ

বারাণসী

রবিবার, ২৪ পৌষ, ১৩৭২

৯।১।৬৬ ইং

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা,—প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

পর পর তোমার দুইখানা পত্রই পাইয়াছি। লামডিং সম্মেলনে যে তোমাদের মতন একটা প্রতিষ্ঠাবান সহরের মূল্যবান মণ্ডলীটীর একটী প্রতিনিধিও আসে নাই, তাহার অন্যান্য কারণের মধ্যে প্রধান কারণ যে মালটিভারসিটি সম্পর্কে ভীতি, ইহা বুঝিতে আমার কোন কষ্ট হয় নাই। এই কারণে আগামী ১০ই বৈশাখের হোজাই সম্মেলন যাহাতে সুষ্ঠরূপে সম্পন্ন হইতে পারে, তজ্জন্য আমি সুষ্পষ্ট ঘোষণা করিয়া দিয়াছি যে, হোজাই সম্মেলনে আমি মালটিভারসিটি সম্পর্কিত কোন প্রস্তাব তুলিতে দিব না, স্বয়ং সেই সম্মেলনে উপস্থিত থাকিব এবং কেহ মালটিভারসিটির অর্থসংগ্রহ সম্পর্কে কোনও প্রস্তাব উত্থাপন করিতে না পারে, তদ্বিষয়ে অবহিত রহিব। মালটিভারসিটি আমার একক মস্তিষ্কের পরিকল্পনা, তোমাদের সমবেত প্রতিভার অবদান নহে।

মঙ্গলবাঁধ ভাঙ্গিয়া না গেলে তাহার সংবাদ তোমরা জানিতে পারিতে মাত্র মালটিভারসিটির দ্বারোদ্ঘাটনের দিন।

তোমাদের আলোচনার আরও অনেক বিষয় আছে। একদা যে তোমরা আমার নিকট দীক্ষা নিয়াছ, ইহা কি আমার প্রদত্ত কোনও প্রলোভনের ফলে? আমি কি তোমাদের কাহাকেও ডাকিয়া অনিয়া দীক্ষার ঘরে বসাইয়াছিলাম? অখণ্ড নামে পরিচয় দিবার অধিকারী হইয়াছ, কিন্তু অখণ্ডের মত কাজ করিতেছ কি? তোমরা প্রত্যেকে বাক্যে, চিন্তায়, ব্যবহারে পূর্ণ অখণ্ড হইবার জন্য কখনও কি চেষ্টা করিবে না?

আগামী তিনশত বৎসরের পরের পৃথিবীর দিকে আমার দৃষ্টি। অখণ্ড-সন্তানগণ আগামী তিনশত বৎসর ধরিয়া যাহাতে ঐ এক ঐতিহ্য লইয়াই চলে, তাহার দিকে তোমরা দৃষ্টি দিয়াছ কি?

সংখ্যায় এবং প্রতিপত্তিতে তোমরা ক্রমশঃ যেরূপ ব্যাপকতা পাইতেছ, তাহাতে আগামী এক বৎসরের মধ্যে অন্ততঃ একহাজার নূতন অখণ্ড-মণ্ডলী স্থাপন করা প্রয়োজন। অখণ্ড-মণ্ডলী স্থাপনের অর্থ জীবে জীবে প্রেমবন্ধন সৃষ্টি করা, বিশ্বের সকল মানুষকে বিশ্বের কল্যাণের জন্য একটী প্রেম-মধুর মিলন-মঞ্চে আনিয়া সমবেত করা। সে কাজে তোমরা অবহিত হইয়াছ কি?

এই জাতীয় আরও বহু সমস্যার সমাধান প্রয়োজন। এই জন্যই আমি বৈশাখ মাসে ডিগবয়, ডিব্রুগড়, তিনসুকিয়া যাইবার কোন প্রগ্রাম রাখিব না। কিন্তু ১০ই বৈশাখ হোজাইতে যাইবার প্রবল ইচ্ছা অন্তরে জাগিয়াছে। নামে মাত্র মণ্ডলীর চূড়ামণি হইয়া বসিয়া রহিলাম

কিন্তু যেদিন আমার গৃহে উপাসনা হইবে না, অন্যের গৃহে হইবে, সেইদিন আমি কিছুতেই উপাসনায় যাইব না, এই জাতীয় মনোভাবের প্রতীকার অত্যাবশ্যক। আমাকে মাথার মণি না করিয়া সমবেত উপাসনার প্রতি অনুরাগ-সম্পন্ন কোনও ছোট চাকুরেকে নেতৃত্ব দিলে তাহাও সহ্য করিতে পারিব না, পুনশ্চ আমাকে সভাপতি রাখিলেও আমি একটী উপাসনায় আসিব না,—এই জাতীয় অবসাদ ও অবিবেচনাকে চুপ করিয়া মানিয়া নেওয়া চলিবে না। গরীব অখণ্ড অবিদ্বান অখণ্ড উপাসনার ঘরে আসিয়াও গরীব এবং অবিদ্বানের তাচ্ছিল্য পাইবে, ইহা চলিবে না। দীক্ষার দিন ত' ধনি-দরিদ্র, পণ্ডিত-মূর্খ, সকলকে সমভাবে একাসনেই বসিতে হইয়াছিল এবং আমার ত' কাহারো প্রতি অসম দৃষ্টি নাই। তবে, এই পাপকে কেন প্রশ্রয় দেওয়া হইবে, কেন সযত্নে বাড়িতে দেওয়া হইবে? কেন ইহার মূল্যোৎপাটন হইবে না? ধর্ম্মের নাম করিয়া আমি আত্ম-বিদ্বেষ ও জাতি-বিদ্বেষ সৃষ্টি করিতে আসি নাই। আমি তোমাদিগকে সর্ব্বসম্প্রদায়ে প্রেম ভাব রাখিতে বলিয়াছি। ইহার উদ্দেশ্য এই নহে যে, অপরকে প্রেম দেখাইতে যাইয়া নিজেদের প্রতি কর্ত্তব্য পালনে কুণ্ঠিত হইবে। ভারতের এক ধীমান পুরুষের ভারতের দুর্ভিক্ষে নাকি প্রাণ কাঁদে নাই, হাতের মুষ্টি শিথিল হয় নাই কিন্তু রাশিয়ার দুর্ভিক্ষ-সংবাদে তিনি মুক্ত হস্তে বিপুল বিত্ত প্রেরণ করিয়াছিলেন। সর্ব্বজনের প্রতি প্রেম প্রশস্য কিন্তু তোমরা নিজজনের প্রতি কর্ত্তব্যে উদাসীন। তোমাদের আত্মসমীক্ষা প্রয়োজন। কেহ চলিতেছ অন্ধ হুজুগে, কেহ চলিতেছ স্বার্থের তাড়নায়,—জীবন্ত জাতির ইহা লক্ষণ নহে। আমি

চাহিতেছি মরণোন্মুখ তোমরা বাঁচিয়া ওঠ। মোহনিদ্রায় দীর্ঘকাল কাটাইয়াছ। অকারণে আয়ূঃক্ষয় আর কতকাল করিবে? ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(১৬)

হরি-ওঁ

বারাণসী

২৪শে পৌষ, ১৩৭২

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা,—প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

এই সঙ্গে একখানা পত্র পাঠাইলাম। পত্রখানা তোমাদের অঞ্চল হইতে ডাকে দেওয়া হইয়াছে। পত্রের মর্ম্ম এই যে, আমরা হরিওঁ কীর্ত্তন করিয়া বড়ই কুকাজ করিতেছি। বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, কেহ চোরা কারবার করিলে তাহাকে তিরষ্কার করিয়া এ জাতীয় পত্রলেখকেরা পত্র লেখেন না বরং নিজেদের প্রিয় নামে অষ্টপ্রহর কীর্ত্তন করিবার উৎসবে সাদরে চোরাকারবারী, পরনারীসক্ত, দেশদ্রোহীকে বড় পীড়ি দেন। এইরূপ দৃষ্টান্ত আমি স্বচক্ষে অনেক দেখিয়াছি।

সুতরাং তোমরা পত্রলেখককে যদি চিনিতেও পার, তাহার এই অহেতুক বিদ্বেষকে নিয়া ঘাটাঘাটি করিও না। তোমরা যে উদ্যম লইয়া এতদিন হরিওঁ নাম-কীর্ত্তন করিয়াছ, তাহার দশগুণ উদ্যমে এখন তোমরা অগ্রসর হও।

মুসলমানকে যদি কেহ বলে, আল্লা-হু-আকবর বলিতে পারিবে

না, তবে সে কি সে কথা মানিবে? তোমাদিগকেও যদি কেহ বলে। হরিওঁ কীর্ত্তন করিতে পারিবে না, তাহা হইলে তোমরাই বা তাহা কেন মানিবে? মুসলমানদের ঈশ্বর-নিষ্ঠার একাগ্রতাটুকু লক্ষ্য কর। তাঁহারা ধর্ম্মের অবমাননা নীরবে কখনো সহ্য করেন না। তোমরা অখণ্ড। গুরু তোমাদের ওঙ্কার উচ্চারণের অধিকার দিয়াছেন। তোমরা কতকগুলি ভীরু, কাপুরুষ, বিপদের সময়ে আত্মরক্ষণে অক্ষম, তথাকথিত সনাতনী হিন্দুর অন্যায় আবদারে হরিওঁ-কীর্ত্তনের অধিকার কেন ছাড়িবে? যাঁহারা হরেকৃষ্ণ করেন বা রাধাশ্যাম গান, কৈ তোমরা ত' কদাচ তাঁহাদের কাছে গিয়া বল নাই,—"থামাও তোমাদের কীর্ত্তন!" বৈষ্ণব পদাবলী নামে যে সকল ধর্ম্মসঙ্গীত সচরাচর গীত হয়, তাহার মধ্যে এমন অতীব অশ্লীল গানও অনেক আছে, যাহা পিতাপুত্র বা মাতাকন্যা একসঙ্গে বসিয়া শুনিতে লজ্জা পায়। অনেক বৈষ্ণব আচার্য্যই সেই সকল সঙ্গীত বন্ধ করিবার জন্য প্রচারণা চালাইয়াছেন, এমন কি রাধাকৃষ্ণতত্ত্ব-সম্পর্কিত যে সকল সঙ্গীতকে মহাজন-পদাবলী বলা হইয়া থাকে, মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য তাহা রায়রামানন্দের সহিত গোপনে শুনিয়াছেন বলিয়া কথিত হয়, যাকে তাকে যখন তখন তাহা শোনানো তিনিও নাকি খুব সুন্দর কাজ বলিয়া মনে করেন নাই।

কিন্তু কৈ, আমরা ত' ঐ সকল পদাবলি সম্পর্কে কোথাও কদাচ বিরূপ মন্তব্য করি নাই বা তাহা বন্ধ করিয়া দিতে বলি নাই। পত্রলেখক যে বৈষ্ণব, তাহা তাঁহার নাম-স্বাক্ষর হইতে বুঝিতে পারা যাইতেছে। তিনি কোন্ অধিকারে তোমাদের বলিতে আসিবেন যে, তোমরা ওঙ্কার নাম জপিও না, তোমরা হরিওঁ কীর্ত্তন করিও না?

এই সকল ধর্ম্মান্ধ অজ্ঞ ধার্ম্মিকেরা তোমাদের অনেক কাজে বাধার সৃষ্টি করিতে পারেন। তোমরা তাহা গ্রাহ্য করিও না। তোমাদের গ্রামের অতি সন্নিকটে বিশুদ্ধ বৈষ্ণব ধর্ম্মের চর্চ্চার দোহাই দিয়া কোনও একজন আচার্য্যপ্রবর কুলনারীকে লাজলজ্জা-বিসর্জ্জনকারী কদাচারে লিপ্ত করিতেছেন, এ সংবাদ এত কালের পুরাতন যে, বাসি হইয়া পচিয়া গিয়াছে। পত্রলেখক ভদ্রলোককে জিজ্ঞাসা করিও, তিনি ত' হরিওঁ-নামকীর্ত্তন বন্ধ করিয়া দিবার জন্য এত ব্যগ্র কিন্তু তিনি তাঁহারই প্রতিবেশী একজন বৈষ্ণবাচার্য্যের বৎসরের পর বৎসর কুলনারীদের সতীত্ব লইয়া বৃন্দাবনের লীলাখেলার ব্যাপারটীতে বাধা জন্মাইবার মানবোচিত কর্ত্তব্যটী পালন করিয়াছেন কি? অন্যে হরেকৃষ্ণ নাম ছাড়া অন্য নাম কীর্ত্তন করিলে বাধা দিব কিন্তু নিজেদের বৈষ্ণব গোঁসাইরা ভক্তিধর্ম্মের দোহাই দিয়া স্ত্রীলোকের লজ্জাশীলতার চূড়ান্ত হানি বৎসরের পর বৎসর কেবলই করিয়া যাইতে থাকিলে, নির্লিপ্ত দর্শকের ন্যায় নীরবে দেখিয়া যাইব, সহিয়া যাইব, ইহা কোন্ দেশী ধার্ম্মিকতা?

প্রয়োজন হইলে হরিওঁ নামের অর্থ মানুষকে বুঝাইয়া দিও। ওম্ মানে হ্যাঁ, yes, হরি মানে যিনি সব কিছু নিজের মধ্যে আহরণ করিয়াছেন। হরিওঁ শব্দের মানে ঈশ্বর আছেন । উপাসনা-প্রণালীতে হরিওঁ শব্দের ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়াছে। তোমরা দীক্ষা নেও কিন্তু ঐ ক্ষুদ্র পুস্তিকাখানা পড়িয়া তাহার অর্থ অধিগত করিতে পার না। এত বৎসর যাবৎ ঐ একটা অঞ্চলে আছ। আজ পর্য্যন্ত মানুষকে বুঝাইতে পারিলে না যে, তোমাদের নাম সর্ব্ব-সম্প্রদায়ের সম্মান অটুট রাখিয়াছে, তোমরা সাম্প্রদায়িক নামের সাধক নহ বলিয়াই সাম্প্রদায়িক দৃষ্টি

তোমাদের নাই, সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ তোমাদের নাই। এই জন্য একজন মণিপুরী ভদ্রলোকের পক্ষে আমার নিকট এইরূপ একখানা পত্র প্রেরণ সম্ভব হইয়াছে। অন্যান্য স্থানে মণিপুরী বৈষ্ণব-সম্প্রদায় আমার মত এবং পথকে শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখিয়া থাকেন। কারণ, সেখানে অখণ্ডেরা সাধন করে এবং উপাসনা-প্রণালীতে লিখিত প্রত্যেকটী উপদেশের অর্থ বুঝিবার চেষ্টা করে।

সর্ব্বজনীন প্রেম তোমাদের আদর্শ, তোমাদের লক্ষ্য, তোমাদের কর্ম্মনীতির নিয়ামক। তবু লোকের বৃথা ভ্রম দূর হয় না, ইহা তোমাদের আলস্যের অপরিহার্য্য ফল। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(১৭)

হরি-ওঁ

বারাণসী

২৪শে পৌষ, ১৩৭২

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা,—প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

শুনিলাম, তোমাদের মণ্ডলীর গৃহনির্ম্মানের জন্য তোমাদের একজন গুরুভ্রাতার নিকট হইতে একশত টাকা পাইয়াছ। জানিয়া সুখী হইলাম। প্রথম কারণ এই যে, প্রয়োজনের সময় টাকাগুলি পাইয়াছ। দ্বিতীয় কারণ এই যে, একা একজনে এতটা ত্যাগ স্বীকার করিয়াছে। তবে, এই বিষয়ে আমার একটা বক্তব্য আছে। তোমরা সকলে মিলিয়া যদি

পঞ্চাশ টাকা আদায় করিতে, আর দূরবর্ত্তী স্থানে অবস্থিত এই গুরুভ্রাতাটী একা পঞ্চাশ টাকা দিতেন কিংবা তোমরা সকলে মিলিয়া আদায় করিতে পঁচিশ টাকা, আর তোমাদের এই গুরুভ্রাতাটী বাকী পঁচাত্তর টাকা দিতেন, তাহা হইলে উহার মধ্যে স্বাবলম্বনের একটা ক্ষীণ রেখা শুষ্ক পাথরের বুকে ছোট্ট একটী রজত-রেখার ন্যায় অলোপ্য হইয়া বসিয়া থাকিত। যে কাজটী সকলের জন্য হইতেছে, তাহাতে সকলে সহযোগ করিবে না, সাকুল্য ব্যয় একটী মাত্র লোকে দিবে, ইহা সামন্ত-তান্ত্রিক যুগের উপযুক্ত আচরণ, আধুনিক যুগের নহে। যেই ব্যক্তি মাসে কিছুতেই চারিশত টাকার বেশী উপায় করে না, তেমন একটা লোকের কাছ হইতে এক সঙ্গে একশত টাকা আদায় করা তাহার প্রতি এক হিসাবে একটা উৎপীড়ন। আমি স্বাবলম্বনকে জীবনের ভিত্তি এই জন্যই করিয়াছি যে, কাহাকেও উৎপীড়িত করিব না। তোমরা তাহার অন্যথা করিতেছ কেন? এইরূপ ভুল ভবিষ্যতে তোমরা আর করিও না। যে একমাসে একশত টাকা নিজেকে উৎপীড়িত করিয়া দিল, কিছুদিন পরেই পুনরায় তোমরা তাহার নিকটে গেলে সে কি তোমাদিগকে প্রসন্ন আননে অভ্যর্থনা করিতে পারিবে? টাকাকড়ির ব্যাপারের মধ্য দিয়া মানুষের সহিত মণ্ডলীর সভ্যগণের অপ্রেম সৃষ্টি করিও না।

বনজঙ্গলে আচ্ছন্ন পার্ব্বত্য অঞ্চলে একখানা ঘর। উদ্দেশ্য, সপ্তাহে একদিন অখণ্ড-সংহিতা পাঠ করা এবং সমবেত উপাসনা করা। সপ্তাহের ঐ নির্দ্দিষ্ট দিনটী ব্যতীত অন্যান্য দিনের অনুষ্ঠান বিভিন্ন জনের বাড়ীতে বাড়ীতে হইয়া থাকে বা হওয়া উচিৎ। এই অবস্থায় একখানা উপাসনাগৃহ কাহারো নিকটেই একটা বিরাট সমস্যা নহে।

বনের ছন ও বাঁশ কাটিতে অভ্যস্ত লোক কি নিজেদের মধ্যে নাই? দড়ি, তার বা বেত দিয়া বেড়া বাঁধিতে জানে বা বেড়া বাঁধাটা শিখিয়া লইতে পারে, এমন লোকের কি তোমাদের মধ্যে একান্তই অভাব? সুতরাং পল্লীগ্রামে একখানা উপাসনার ঘর তৈরী করা কোনও গুরুতর সমস্যা নহে। সকলে খাটিলে খুটিলে এবং যাহার হাতের কাছে যেই গৃহ-নির্ম্মাণোপকরণ সুলভ্য, সে তাহার সংগ্রহে আংশিক ত্যাগ স্বীকার করিলে একখানা উপাসনা-ঘর প্রায় বিনা খরচেই হইয়া যাইতে পারে। সুতরাং একজনের উপর বিরাট চাপ দিবার কোন প্রশ্নই আসে না।

অবশ্য সহরাঞ্চলের কথা ভিন্ন। অনেক স্থানে খড়ের ঘর তৈরীর বাধা দিবেন সরকার অথবা পৌর প্রতিষ্ঠান। সেখানে ইটের ঘর তুলিতে হয়, সেখানে নক্সা, হিসাবপত্র, স্থপতির অনুমোদন ইত্যাদি প্রয়োজন পড়ে। সেখানে অধিকাংশ ক্ষেত্রে গৃহ-নির্ম্মাণ শেষ করিবার একটা নির্দ্দিষ্ট সময়-সীমা থাকে। সেখানে প্রচুর অর্থ হাতে না লইয়া কাজে নামা যায় না।

তেমন স্থানে তুচ্ছ তুচ্ছ পরিমাণের দানে জিনিষ গড়িয়া উঠিতে পারে না। সেখানকার সমস্যা সমাধানের জন্য নির্দ্দিষ্ট পরিকল্পনা লইয়া অগ্রসর হইতে হয়, উপাসনা-গৃহ নির্ম্মানের জন্য একটা ভাণ্ডার করিতে হয়, তিল তিল করিয়া অর্থ সংগ্রহ করিয়া সেই ভাণ্ডারে সঞ্চয় করিতে হয়। এই ভাণ্ডার হইতে অন্য কোনও প্রয়োজনে টাকা তোলা হইবে না, এই জিদ লইয়া দাঁত মুখ খিটিয়া কাজ করিয়া যাইতে হয় এবং কাজ আরম্ভ করিবার মতন মোটামোটি টাকাটা হাতে আসিয়া গিয়াছে, ইহা দেখিবার পর যেখানে যাহার যাহা সাধ্য,

তাহার চূড়ান্ত সীমায় উঠিবার জন্য প্রেরণা দিতে হয়। সামান্য সর্দ্দি-জ্বরেও যদি স্ট্রেপটোমাইসিন ইন্‌জেক্‌শান দাও, তাহা হইলে যক্ষ্মা জ্বরের সময় কি করিবে?

বারাণসী অযাচক আশ্রমের নূতন উপাসনা-মন্দিরে এই যে গত ১২ই পৌষ রৌপ্যময় নূতন বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত হইলেন, মনে করিও না যে, এতবড় বিরাট বাড়ী কাহারো দানের টাকায় হইয়াছে। অর্থার্জ্জনের যে সৎ প্রতিষ্ঠান বহু বৎসর পূর্ব্বে আমি স্থাপন করিয়াছি, যাহাতে আমি শ্রম ঢালিয়াছি, অর্থ ঢালিয়াছি কিন্তু যাহা হইতে নিজের অন্নবস্ত্রের জন্যও একটী কপর্দ্দক গ্রহণ করি নাই, তাহারই কণা কণা আয় একত্র হইয়া লক্ষাধিক মুদ্রার হর্ম্ম্য নির্ম্মাণ করিয়াছে। ইহার মধ্যে কাহারো কোন দানের অর্থ নাই। ইহা নির্ম্মিত হইয়া যাইবার পরে যদি ইহার জন্য অর্থ আসে, আসুক, না আসিলেই বা কিসের দুশ্চিন্তা?

অন্য গুরুর শিষ্যদের সম্মুখে এইরূপ কোন দৃষ্টান্ত আছে কি না, আমি জানি না। কিন্তু তোমাদের চোখের সম্মুখে জাজ্জ্বল্যমান ভাবেই রহিয়াছে। তোমরা কেন স্বাবলম্বনের ভাবে উদ্দীপ্ত হইবে না, ইহা আমি বুঝিতেছি না। আগে যাহাকে ব্রিটিশ ত্রিপুরা বলিত, এখন যাহাকে কুমিল্লা জেলা বলা হয়, সেখানে একদা আমি গ্রামে গ্রামে নৈশ বিদ্যালয় খুলিয়াছিলাম, যাহার শিক্ষকেরা কাজ করিতেন অবৈতনিক অর্থাৎ শ্রমদান করিতেন, আর, প্রত্যেক বিদ্যালয়ের রাত্রিতে জ্বালিবার কেরোসিনের দাম আমি সংগ্রহ করিয়া দিতাম নানা পল্লীর পথ-নির্ম্মাণ ও পুকুর-খননের কাজে মজুরের শ্রম করিয়া। এই সকল ঘটনার সাক্ষীরা এখনও অনেক জীবিত আছেন। তোমরা কেন স্বাবলম্বনে বিশ্বাস করিবে না?

কোনও কোনও স্থানে মণ্ডলীগুলিতে প্রয়োজনীয় অর্থ স্থানীয় লোকদের কাছ হইতে সংগৃহীত হয় না। দেখিয়াছি, কর্ম্মীরা অযাচক আশ্রমের ঔষধের, পুস্তকের এবং পত্রিকার এজেন্সি লইয়া কমিশন-লব্ধ ন্যায়োপেত অর্থ নিজ পকেটে না ঢুকাইয়া মণ্ডলীর কাজে দিতেছেন। এই সকল দৃষ্টান্ত কি তোমাদিগকে উদ্বুদ্ধ করে না? মান-অভিমান পরিত্যাগ করিয়া কয়েক দিন ঠেলা-গাড়ী ঠেলিলেও মণ্ডলীর প্রয়োজনীয় মাসিক অর্থ যোগাড় করিয়া লওয়া যায়। শ্রমকে তাহার প্রকৃষ্ট মর্য্যাদা দিয়া শ্রমশীলতার অভ্যাস করিলে মাত্র কয়েক জন লোক চেষ্টা করিলে একটা বিরাট মণ্ডলীর সমস্ত ব্যয় চালাইতে পারে। অকারণে উদ্বিগ্ন হইয়া তোমরা গুরুভাই ও গুরুভগিনীদিগকে চাঁদার জন্য উৎপীড়িত করিও না। টাকা আদায় করার চাইতে শ্রম আদায় করা মহত্তর এবং অধিকতর লাভজনক অধ্যবসায়।

কোনও কোনও মণ্ডলীতে শুনিতে পাই, সমবেত উপাসনার ভোগ-নৈবেদ্যের পয়সা জোটে না। ইহা একটী তাজ্জব খবর। প্রথম কথা এই যে, ভোগ-নৈবেদ্য ব্যতীতও সমবেত উপাসনা সিদ্ধ। ভোগ-নৈবেদ্য সমবেত উপাসনার বাধ্যকর উপাঙ্গ নহে। দ্বিতীয়তঃ, সমবেত উপাসনা ত' সকলের উপাসনা, সকলের জন্য উপাসনা। ইহাতে যোগ দিয়া তুমি কাহাকেও অনুগৃহীত করিতেছ না, বরং তুমি যে যোগ দিতে পারিতেছ, ইহাই তোমার ভাগ্য। এমতাবস্থায় শূন্য হস্তে আসিবে কেন? কেহ একটী মোয়া, কেহ একটী নাড়ু, কেহ এক পয়সার বাতাসা হাতে করিয়া কেন আনিবে না! সমবেত উপাসনায় আসিয়াছ, না, একজনের কন্যাদায় উদ্ধার করিতে আসিয়াছ, এইরূপ হীন মনোভাব তোমাদের থাকিবে কেন? সমবেত উপাসনার মধ্য

হইতে পৌরহিত্যের উপদ্রবকে দূর করিয়াছি বলিয়া কি এখন ইহা একটা যথেচ্ছাচারের তাণ্ডবভূমি হইবে? উপাসনা যেই মন্দিরেই হউক, যাহার গৃহেই হউক, তোমরা প্রত্যেকে ইহার আয়োজক। নির্দ্দিষ্ট একটা লোককে বা একটা দলকে কেন ইহার ভোগ-নৈবেদ্য পুষ্পবিল্বপত্র সবকিছু জোগাড় করিয়া নিবার দায়িত্ব নিতে হইবে? সমবেত উপাসনা সর্ব্বজনের কল্যাণে,—যাহার গৃহে উপাসনার অনুষ্ঠান হইতেছে, তাহারও কল্যাণে, যাহারা উপাসনায় যোগ দিতেছে, তাহাদেরও কল্যাণে। সমগ্র জগতের কল্যাণকে বিস্মৃত হইয়া কাহারো একার কল্যাণ আমার প্রবর্ত্তিত সমবেত উপাসনার তত্ত্বে কোথাও নাই।

আশা করি প্রত্যেকটী কথা ধীর চিত্তে পড়িবে। ভগবানকে ডাকিয়া বল,—"হে পরমেশ্বর, শুদ্ধা ভক্তি দাও। কেবল ভেড়ার পালের মতন অন্ধ সংস্কারের যেন অনুসরণ না করি। আমরা যেন স্বাবলম্বনের উপর দাঁড়াইয়া জীবনের প্রত্যেকটী কাজ করি।" ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(১৮)

হরি-ওঁ

বারাণসী

মঙ্গলবার, ২৬ পৌষ, ১৩৭২

১১।১।৬৬ ইং

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

আজ ঘুম হইতে উঠিয়াই মনে মনে স্থির করিয়াছিলাম,

অনেকগুলি পত্র লিখিব। লিখিয়াছিও। কিন্তু আজই লালবাহাদুর শাস্ত্রীর তাসখন্দে মৃত্যুর সংবাদটী রেডিও-প্রমুখাৎ অবগত হইলাম। স্বাধীন ভারতে আঠারো-বৎসর-ব্যাপী আত্মবঞ্চনায় বিবেক কথা বলা বন্ধ করিয়াছিল, অন্ধ স্তাবকতা এবং নিরর্থক দাসত্ব মানুষের বুদ্ধির মেরু আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছিল। এই একটী পুরুষ-রত্নের কণ্ঠে সেই অবরূদ্ধ বিবেক মাত্র আধ-আধ বুলি সুরু করিতে না করিতে এই কণ্ঠ চিরতরে স্তব্ধ হইয়া গেল, এই ব্যথায় আমি একখানা পত্রেও এককণা আনন্দ পরিবেশন করিতে পারি নাই।

কিন্তু তোমার পত্র খুলিয়া অট্টহাসি হাসিতে হইল। চিঠির মধ্যে আমার জন্মদিনের উপহার পাঠাইয়াছ। জন্মদিনের উপাসনা-সঙ্গীত রেকর্ড হইয়া থাকিবে আশায় বার্ম্মিংহাম হইতে শ্রীমতী সরলা বালা দে কয়েক মাস আগে পাঠাইয়া রাখিয়াছে একটী অত্যন্ত দামী টেইপ-রেকর্ডার। যোড়হাট হইতে জন্মদিনের উপহার স্বরূপ শ্রীমান্ পরেশচন্দ্র সরকার পাঠাইয়াছে একটী দামী ট্রান্‌জিষ্টার রেডিও। কলিকাতা হইতে শ্রীমান্ মানবেন্দ্র নাগ জন্মদিনের উপহার দিয়াছে, গিবনের রচিত রোমের পতনের ইতিহাস। এইরূপ কতজনে কত কিছু। কিন্তু তোমার দান বিচিত্র। তুমি পাঠাইয়াছ কতকগুলি ডাকটিকিট। উদ্দেশ্য, পত্রযোগে আমার বাণী যেন স্থানে স্থানে যায়। সকলের প্রেরিত উপহারই আমার পরম আদরের সামগ্রী কিন্তু উপহার-নির্ব্বাচনে তুমি এক অপূর্ব্ব কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছ।

কবি মন্মথনাথ গুপ্ত তোমার গুরুভাই ছিলেন। একবার জন্মদিনে তিনি এক কবিতা উপহার দিয়াছিলেন,—

"বাবার যা কিছু আয়,
সবই যায়—
ছাপাখানায়,
গাছপালায়, আর
রেলভাড়ায়।
যদি বা কিছু টিকে,
তা'ও যায়
ডাকটিকিটে।"

—মন্মথ—

যাহার মর্ম্ম এই যে, বাবামণিকে টাকা দিয়া লাভ নাই। কারণ, তিনি তাহা দিয়া অন্ন, বস্ত্র, আচ্ছাদন, শয্যা, ছত্র, পাদুকা কিছুই কিনিবেন না, কিনিবেন পত্র লিখিবার জন্য ডাকটিকিট। মন্মথের সেই মর্ম্মকথা মন্মথকে না জানিয়াও তাহার সেই কবিতা পাঠ না করিয়াও তুমি উপলব্ধি করিয়াছ। আমি বলিব, তুমিও কবি। যেখানে অপরে কোনও সৌন্দর্য্য দেখিতে পায় না, সেখানেই যাহারা সৌন্দর্য্য দেখে, তাহারা কবি। আমার চিঠিলেখা কাহারও দৃষ্টিতে পণ্ডশ্রম, কাহারও দৃষ্টিতে বৃথা আয়ুক্ষয়, কাহারও দৃষ্টিতে সরকারী ডাক-বিভাগকে অকারণে ধনী করা, কিন্তু তোমার দৃষ্টিতে ইহা একটী কলা, ইহা দেশে দেশে প্রাণে প্রাণে নব উদ্দীপনা, নবীন প্রেরণা, অভ্যুন্নত উচ্চাকাঙ্ক্ষা জাগাইয়া তোলার বৈতালিক-গীতির অভিযান। তোমার উপহার-নির্ব্বাচনে বিশেষত্ব আছে।

যদিও আজ পত্র লিখিবার রুচি আমার কম, তবু তোমার প্রেরিত ডাকটিকিট কয়খানা নিঃশেষিত না হওয়া পর্য্যন্ত পত্রই লিখিব।

কাল বেলা সাড়ে নয়টায় চলিয়া যাইতেছি আরা জেলার কোয়েলোয়ার। পরশু পুপুন্‌কী। তরশু পুপুন্‌কী থাকিব। তার পরের দিন নিয়ামৎপুর, আসানসোল, অণ্ডাল, দূর্গাপুর থামিয়া বৈদ্যবাটী এবং ২রা মাঘ প্রাতে সাড়ে আটটায় কলিকাতা। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(১৯)

হরি-ওঁ

মঙ্গলকুটির, পুপুন্‌কী
শুক্রবার, ১৪ই মাঘ, ১৩৭২
২৮।১।৬৬

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা,—প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

আমি নিরাপদে পুপুন্‌কী পৌছিয়াছি। এখানে জনতার ভীড় নাই। এই জন্যই দুইদিনের বিশ্রামে শরীর খুব সুস্থ বোধ করিতেছি। তোমাদের পরামর্শে এবার যদি কলিকাতায়ই থাকিতাম, হয়ত মৃত্যু হইত। কলিকাতার জনতার বুদ্ধিহীন আবেগ কোন প্রকারেই দমন করা যাইত না। এই জন্যই জিদ্ করিয়া চলিয়া আসিয়াছি। আসিয়া ভাল করিয়াছি।

তোমরা যে ভাবে আমাকে সর্ব্বব্যাপারে সেবা দিতে চেষ্টা করিয়াছ, তাহাতে মুগ্ধ হইয়াছি। কলিকাতা অঞ্চলের ছেলে-মেয়েদের মনে স্নেহ, প্রেম, ভক্তি ও ভালবাসা গভীরতর হইতেছে, ইহা উপলব্ধি করিয়াছি। কিন্তু নানা কারণে জনতার ভীড় সম্পর্কে তোমাদের একটু কঠোর হইতে হইবে। তাহা হইলে তোমাদের ভিতরে শৃঙ্খলা আসিবে,

শৃঙ্খলা আসিলেই বল বাড়িবে। বল যদি না বাড়ে, কেবল ভক্তি বাড়িলেই তোমরা কেহ বিশেষ কিছু করিতে পারিবে না। বল আসে শৃঙ্খলায়, বল আসে ঐক্যে, বল আসে ধৈর্য্য এবং সহিষ্ণুতায়। ভক্তির ফলে আসে নিষ্ঠা অর্থাৎ লাগিয়া থাকিবার শক্তি ও অভ্যাস। সুতরাং ভক্তি নিন্দনীয় নহে। কিন্তু জগতে যাহারা বলহীন, তাহাদের ঈশ্বর-ভক্তি একক সাধনার দিক দিয়া অশেষ সার্থকতা লাভ করিতে পারিলেও সকলের ভালমন্দের প্রশ্ন যেখানে জড়িত, সেখানে শৃঙ্খলা ও সংহতি চাইই চাই, যেরূপ ধৈর্য্য, যেরূপ সহিষ্ণুতা শৃঙ্খলাবর্দ্ধক ও সংহতিকারক, তাহা চাইই চাই। এগুলি যাহাদের নাই, তাহারা ভক্তি-পুলকে কাঁদিবে অথবা উচ্চাঙ্গের দর্শনশাস্ত্র লিখিবে কিন্তু জীবন-যুদ্ধে বারংবার পরাজিত হইবে এবং পড়িয়া পড়িয়া পাপিষ্ঠ আর পামরদের হাতে কেবল মার খাইবে। সমস্ত জাতির মেরুমজ্জায় কাপুরুষতার যে সংক্রামক বীজানু প্রবেশ করিয়া রহিয়াছে, তাহাকে ভক্তি-ধর্ম্ম বা ঈশ্বরনিষ্ঠতা বলিয়া ব্যাখ্যাত করিবার মতন কুকার্য্য আর কিছুই হইতে পারে না। ঐক্যহীন, শৃঙ্খলাহীন গোষ্ঠীগুলি নিজেদের অন্তরের ভক্তির উন্মাদনায় দেহমনে নানা সাত্বিক ভক্তির লক্ষণ ফুটাইয়া তুলিতে পারে কিন্তু দুর্ব্বৃত্তের অন্যায় আবদারের সমক্ষে লেজ গুটাইয়া নতি স্বীকারের মতন নাস্তিক্য জগতে আর কিছুই নাই। মুখে বলিব ঈশ্বর আছেন, আর বিপত্তির সম্ভাবনা দেখিলে আগন্তুক কর্ত্তব্যকে তুচ্ছ করিয়া আমরা যে উচ্চ উচ্চ তত্বকথার আড়ালে আত্মগোপন করিতে চাই, তাহার প্রধানতম কারণ হইতেছে আমাদের ঐক্যহীনতাজনিত, শৃঙ্খলাহীনতাজনিত, সংহতিহীন তাজনিত, ধৈর্য্য-শক্তির অভাব হইতে জাত, সাত্বিক সহিষ্ণুতার অপ্রাচুর্য্য হইতে সৃষ্ট অপার অসীম দুর্ব্বলতা।

সাধকে আর সৈনিকে কি কিছু পার্থক্য আছে? সৈনিকের জীবন দেশকল্যাণের চরণে উৎসর্গীকৃত। সাধকের জীবনও কি তাহাই নহে? সৈনিকদিগকে শৃঙ্খলা শিখিতে হয়, তোমাদিগকে কেন তাহা শিখিতে হইবে না?

আমি আজীবন মহত্ত্বের পূজা করিয়াছি, কাপুরুষকে কদাচ মহৎ বিবেচনা করি নাই। বল নাই বলিয়াই অধিকাংশ সময়ে মানুষ কাপুরুষ হয়। সাগরতুল্য ব্যাপকতা লইয়া তোমাদের ভক্তি প্রসারিত হউক কিন্তু কেন তাহা বলসমন্বিত হইবে না? কেন তাহা শৃঙ্খলা মানিবে না? বিশালতম সমুদ্রেরও কোথাও না কোথাও বেলাভূমি আছে, যেখানে ক্ষিপ্ত তরঙ্গ-মালা বারবার আছাড়িয়া পড়িয়া ফিরিয়া ফিরিয়া আসে। তোমাদেরও ভক্তিসমুদ্রের বেলাভূমি থাকা প্রয়োজন। তাহার নাম শৃঙ্খলা। নিখিল বিশ্বকে প্রেম বিলাইবার জন্য করিতেছ জীবন-গঠন। তোমরা বিশ্বের জনগণের সহিত তোমাদের সম্পর্ক ভুলিয়া কেবল উন্মাদনার সাহায্যে পরমেশ্বরকে বশীভূত করিবে? যেখানে একটী মানুষকে লইয়া প্রেমের বন্ধন, সেখানে মানুষ উন্মত্ত হইতে পারে কিন্তু যেখানে কোটি বিশ্বকে লইয়া আলিঙ্গনের বাহু-প্রসারণ, সেখানে উন্মাদনার স্থান কোথায়?

কথাগুলি ভাব। ভাবিতে ভাবিতে তত্ত্বের গভীর গহনে প্রবেশ কর, রসের মণিমঞ্জুষা প্রেমের চাবিকাঠি দিয়া উন্মোচিত কর, অমৃতকে করায়ত্ত কর এবং সকলকে বিলাইয়া দাও। ভালবাস যোগস্থ হইয়া, কর্ম্ম কর সমাধিস্থ রহিয়া, জীবনকে আস্বাদন কর সৃষ্টি ও স্রষ্টায় অভেদত্ব স্থাপন করিয়া। তোমার প্রবুদ্ধ চেতনা বিশুদ্ধ প্রত্যয়ের সহিত মিলিত হউক। নদীতে প্রাণ জুড়িয়া প্রেমের স্রোত প্রবাহিত হউক

কিন্তু সে তরল কেন থাকিবে? ক্ষীরের মতন ঘন সে কি হইতে পারে না? ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(২০)

হরি-ওঁ

মঙ্গলকুটীর, পুপুন্‌কী
মঙ্গলবার, ১৮ মাঘ, ১৩৭২
১।২।৬৬

কল্যাণীয়াসুঃ—

স্নেহের মা,—প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

মহান্ গুরু পাওয়া যেমন ভাগ্যের কথা, ভক্তিমান্ গুরুভাই-গুরুবোন পাওয়াও তেমন ভাগ্যের কথা। মহান্ গুরুর দর্শন, সান্নিধ্য বা নির্দ্দেশ পাওয়া একটা তুচ্ছ ব্যাপার নহে। ইহার মধ্যে ভগবানের অপার করুণার নিদর্শন রহিয়াছে। আমি প্রচলিত গুরুবাদ মানি না কিন্তু গুরুর গুরুত্বকে এবং মহত্বকে প্রাণে মনে স্বীকার করি। দেশ-প্রচলিত অন্ধ কুসংস্কারের আদি সৃষ্টির পশ্চাতে যে মঙ্গলময় উদ্দেশ্যটুকু ছিল, যে কল্যাণময় সদ্‌যুক্তিটুকু ছিল, তাহাকে এক কথায় আমি নাকচ করিয়া দেই নাই। কিন্তু আমার চিন্তা ও দৃষ্টি দেশ-প্রচলিত কুসংস্কারের ঊর্দ্ধলোকে বিচরণ করিতেছে। এই জন্যই আমি সর্ব্বজনের, সর্ব্বকালের, সর্ব্বব্যাপক ও সর্ব্বাঙ্গীন কুশলের দিকে তাকাইয়া তারস্বরে এমন অনেক কটুকথা উচ্চারণ করিয়াছি, যাহা অনেক কাল কেহ বলেন নাই, বলিতে সাহস পান নাই। জনতার বিরোধ বা মূঢ়তার

প্রতিরোধকে আমি গণনায় আনি না কিন্তু গণদেবতার প্রতি অঙ্গে যে আমার প্রভু নিখিল বিশ্বাধিক বিশালত্ব লইয়া নিয়ত বিরাজ করিতেছেন, ব্রহ্মই যে সব, সবই যে ব্রহ্ম, তিনি ছাড়া আর কিছু যে নাই, ছিল না, থাকিবে না, যাহা কিছু আছে, সবই যে তিনি, থাকা আর না-থাকার মধ্যে সকল বিরোধের মীমাংসা করিয়া দিয়া তিনি যে নিত্যকাল সর্ব্বত্র সংস্থিত, এই সত্যে আমি সুস্থির আছি। আমি অনুভব করি যে, আমিই ব্রহ্ম, ব্রহ্মই আমি। এইজন্যই আমি অনুভব করি যে, আমার শিষ্য আর আমি এক।

তোমরা ভক্তি-ভাবে ভাবিত, এই জন্য তোমাদিগকে উপদেশ দেই, আমি নিয়ত তোমাদের সঙ্গে আছি, তোমাদের দূরে আমি নহি, তোমাদের কাহাকেও আমি নিমেষের তরেও পরিত্যাগ করি না, সুখে দুঃখে সম্পদে বিপদে নিদ্রায় জাগরণে উত্থানে পতনে সর্ব্বদা সর্ব্বাবস্থায় আমি তোমাদের নিত্যসাথি, নিত্যসঙ্গী।

এই সত্যে যদি বিশ্বাস কর, তাহা হইলে তোমরা তোমাদের গুরুভাই ও গুরুবোনদিগকে তুচ্ছ জ্ঞান করিতে পার না। তাহাদের সহিত তোমাদের সম্বন্ধ যে কত গভীর আপনত্বের, তাহা অস্বীকার করিতে পার না। পিতামাতা নিজ নিজ শরীরের অংশ হইতে পুত্রকন্যাদের জন্ম দেন, তাই না ভাই-বোনেরা পরস্পরের আপন হয়! গুরু তোমাদিগকে আত্মার মহিমায় নবজন্ম দেন, তাই প্রতিটি গুরুভ্রাতা ও গুরুভগিনীর সহিত তোমাদের সম্পর্ক আত্মার গভীরে সৃষ্ট হইয়াছে। প্রত্যেকে প্রত্যেককে আত্মার আত্মীয় বলিয়া জানিতে, বুঝিতে, স্বীকার করিতে, জীবনের কার্য্যাবলিতে প্রতিষ্ঠিত করিতে চেষ্টা কর। এই প্রাথমিক চেষ্টা হইতে তোমাদের মধ্যে ফোটে বিশ্বব্যাপী সর্ব্বমানবের,

সর্ব্বজীবের প্রাণের প্রতিটি প্রকাশের প্রতি আত্মীয়তার সৃষ্টি হইবে। খ্রীষ্ট-ধর্ম্মে charity বা দানশীলতার অশেষ প্রশংসা আছে কিন্তু ইংরাজীতে একটী বচন আছে, charity beings at home,— বদান্যতান্দ সুরু হয় সর্ব্বপ্রথম নিজগৃহের গণ্ডীতে। গণ্ডীবদ্ধতার এই সঙ্কীর্ণতাটুকু দোষের নহে, যেহেতু ইহা বিশ্বপ্রসারিণী প্রীতি ও সহানুভূতির অগ্রভূমিকা। একটী সতীর্থও অপর সতীর্থের সহিত কোনও অন্যায় ব্যবহার করিও না, একজনেও অপর জনকে কুবাক্য প্রয়োগ করিও না, একজনেও অপরের সহিত অন্ন, বস্ত্র, অর্থ, সম্পত্তি, যশ-প্রতিপত্তি বা কর্তৃত্ব-নেতৃত্ব লইয়া প্রবঞ্চনা করিও না। পাটনার একজন উকিল একদিন কল্যাণীয়া সাধনাকে বলিতেছিলেন,—"দিদি, ডাইনী বুড়ীরও এইরূপ একটা নিয়ম থাকে যে, জগৎশুদ্ধ সকলের সে অনিষ্ট করিলেও গ্রামের একটী ঘর সে রাখিবে, যে ঘরের কোনও অপকার সে করিবে না; ঠিক তেম্‌নি আমরা ব্যবহারজীবীরাও এমন দুই একটী ব্যক্তি বাছিয়া লই, যাঁহার কাছ হইতে মামলা-মোকদ্দমার জন্য কোনও পয়সা-কড়ি লইব না। আপনি আমার সেই ব্যক্তি, যাঁহার জন্য কাজ করিয়া কদাচ পারিশ্রমিক নিতে পারি না।" তোমাদেরও লক্ষ্য হউক, তোমরা কোনও গুরুভ্রাতা বা গুরুভগিনীর কদাচ কোনও অনিষ্ট করিবে না। জিদ্ করিয়া যদি এই একটী কাজ করিয়া যাইতে থাক, তাহা হইলে তোমরা নিজেদের মধ্যে এমন এক পরিপার্শ্ব সৃষ্টি করিতে সমর্থ হইবে, যাহা জগন্ময় শান্তির, প্রেমের, ভালবাসার আবহাওয়া সৃষ্টি করিয়া চলিবে। তোমাদের মতন দু-দশ হাজার বা দু-দশ লক্ষ নরনারী যখন এইরূপ হইয়া উঠিবে, তখন তোমরা নিজেদের মধ্যে বিন্দুদাধারের এমন এক কেন্দ্রবিন্দু সৃষ্টি করিবে,

যাহা দিকে দিকে দেশে দেশে কালে কালে কেবল প্রেমেরই প্লাবন সৃষ্টি করিতে থাকিবে। এই জন্যই তোমাদের প্রতিজনের আজ বদ্ধপরিকর হওয়া প্রয়োজন যে, একটী অখণ্ডও অপর অখণ্ডকে বিপথে চলিতে দিবে না। কিন্তু ইহা করিতে হইলে তোমাদের নিজেদের প্রত্যেককে আগে বিপথের বিপদ হইতে সতর্ক হইয়া যাইতে হয়।

বিগত পঞ্চাশ বৎসর ধরিয়া আমি বলিয়া আসিতেছি, গুরুভাই বা গুরুভগিনীর সংখ্যা বাড়াইবার জন্য কোনও চেষ্টা করিও না। কেন না, এই জাতীয় চেষ্টায় নামিলেই সর্ব্বত্র দেখিয়াছি উৎসাহী ভক্তেরা কতকগুলি মিথ্যা অলৌকিক কাহিনী রচনা করিতে প্ররোচিত হয় এবং জনসাধারণের সাধারণ বিচার-বুদ্ধিকে আড়ষ্ট করিয়া দিয়া কর্ম্মময় জগতে অলৌকিক ব্যাপারে নির্ভরশীল কতকগুলি অদৃষ্টবাদী অপদার্থের প্রাদুর্ভাব ঘটাইয়া থাকে। কর্ম্মে ইহাদের নির্ভর শিথিল হইয়া যায় বলিয়া নিজেদের নানা দুর্ব্বলতা ও অযোগ্যতার পিতলকে গিল্টি করিয়া সোণার মত দেখাইবার প্রয়োজন ঘটে এবং পিতলের এই সুবর্ণত্ব সকলকে দিয়া স্বীকার করাইয়া লইবার জন্য একটা সুমহৎ "আদেশ বা অথরিটির" তাহারা তল্লাস করে। ইহার ফলে অনেক স্থানে কামকাঞ্চনের দাস, অতীব দুর্ব্বলচরিত্র কোনও লম্পট বা প্রতারক মহাপুরুষদের অজিনাসনে বসিয়া পড়ে বা অবতারত্বের ব্যাঘ্রচর্ম্ম পরিধান করে। অন্য দেশের কথা জানি না, এই দেশের ইহাই এক আশ্চর্য্য মনস্তত্ত্ব, যাহা আমি কৈশোর হইতে লক্ষ্য করিয়া আসিতেছি। এই জন্যই অর্দ্ধ শতাব্দীর অধিক কাল ধরিয়া গুরু রূপে তোমাদের মধ্যে দোর্দ্দণ্ড-প্রতাপে বিচরণ করিয়াও কদাচ তোমাদিগকে গুরুভ্রাতা বা গুরুভগিনীর সংখ্যা বৃদ্ধিতে উৎসাহ দিতে পারি নাই। ভাবিয়াছি,

শেষ পর্য্যন্ত তোমরা যদি অলৌকিকের ইন্দ্রজাল রচনা করিয়া ভানুমতীর খেলা সুরু করিয়া দাও এবং ধর্ম্মসাধনা একটা প্রতারণার কৌশলে গিয়া পরিণত হয়, তবে তখন আমি তাহার কি প্রতীকার করিব? সর্ব্বত্র ত' মানুষ গুরুর কাছে ধর্ম্মদেশনা গ্রহণ করে নিজের মুক্তির জন্য,—সেই ব্যক্তিগত মুক্তির মোহ তাহাকে এমন করিয়া আচ্ছন্ন করিয়া রাখে যে, তাহার ধর্ম্মচর্য্যা দ্বারা দেশ, জাতি, জগৎ ও সভ্যতার কোনও ক্ষতি হইতেছে কি না, ইহা বিচার করিয়া দেখিবার অবসর তাহার জোটে না। সে বিপুল বিক্রমে ধর্ম্মাচরণ করিয়া যায়, নিজে তৃপ্ত হয় এবং আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যে যশোলাভ করে। ব্যস, সেইখানেই ফুরাইয়া গেল। কিন্তু আমার অর্দ্ধ শতাব্দীর পরিশ্রমে আজ তোমাদের সুদৃঢ় প্রত্যয় জন্মিয়াছে যে, একক মুক্তির কোনও অর্থ নাই, বিশ্বের সকলের মুক্তি আহরণ করিবার জন্য তোমাদের প্রতিজনের ক্ষুদ্র তুচ্ছ ব্যক্তিগত সাধন, জগতের সকলের মঙ্গলের জন্য তোমাদের প্রতিজনের জন্মগ্রহণ, জীবন-ধারণ, মরণ-বরণ। তোমাদের আজ গুরুভ্রাতা ও গুরুভগিনীর সংখ্যা-বৃদ্ধির চেষ্টায় অধিকার আসিয়াছে। বিশ্বের প্রতিজনকে বিশ্বের সকলের কুশলের জন্য আত্মদানের সাধনায় দীক্ষিত হইবার প্রেরণা দেওয়াতে তোমাদের কেবল অধিকারই জন্মে নাই, ইহা আজ তোমাদের কর্ত্তব্যে পরিণত হইয়াছে।

তুমি তোমার জীবনের দুর্য্যোগের যে বর্ণনা দিয়াছ, তাহা পাঠ করিয়া বড়ই ব্যথিত হইলাম। স্বামী হঠাৎ জীবিকাহীন হইয়া পড়ায় সংসার-প্রতিপালনের জন্য একটা চা-বাগিচায় আসিয়া নার্সের চাকুরী লইয়াছ শুনিয়া দুঃখিতও হইলাম, সুখীও হইলাম। দুঃখিত হইলাম এই জন্য যে, তুমি যদি পড়াশোনায় লাগিয়া থাকিতে পারিতে, প্রচুর

বিদ্যা অর্জ্জন করিতে পারিতে, তাহা হইলে একদা তোমার বিদ্যা ও জ্ঞান সর্ব্বমানবের অধিকতর সেবায় আসিতে পারিত। সুখী হইলাম এই জন্য যে, তুমি স্বাবলম্বী হইয়াছ, নিজের পায়ে দাঁড়াইয়াছ আর এমন বৃত্তি নিয়াছ, যাহাতে মানুষের সেবা হয়। হাসপাতালের প্রতিটি রোগী ও রোগিণীর ভিতরে তোমার পরমারাধ্য পরমেশ্বরকে দর্শন করিয়া প্রাণভরা ভক্তি লইয়া ঐ দুঃখী মানুষগুলির সেবা কর। সেবা একাধারে জীবিকার সংস্থানকারী সৎকর্ম্ম এবং ধর্ম্মসাধনায় পরিণত হইবে। প্রত্যেকটী রোগীর প্রাণে জ্বলন্ত ঈশ্বর-বিশ্বাস জাগাইবার জন্য চেষ্টিত হও। ইহাদের প্রতিজনের যে জগতের জন্য কিছু করিবার আছে, এই কথাটী ইহাদের মনে অঙ্কিত করিয়া দাও। তোমার ন্যায় নার্সের সাহচর্য্যে আসিবার ফলে সে যেন ঘরে ফিরিবার কালে একটী নূতন মানুষ হইয়া ফিরে। তাহার যেন দেহের রোগ নিরাময় হইবার সঙ্গে সঙ্গে মনের ভিতরেও নূতনত্বের সৃষ্টি হয়।

তোমার ছোট ভাই দুইটী অল্প বয়সেই জীবিকার সন্ধানে বাহির হইয়াছে, ইহাতে দুঃখিত হইও না। আশীর্ব্বাদ করি, তাহারা যুদ্ধ করিয়াই জগতে জয়ী হউক। যুদ্ধ না করিয়া যে জয়লাভ, তাহাতে গৌরব অপেক্ষা দৈন্য অধিক। তাহাদিগকে আমার আশীর্ব্বাদ জানাইও। কোনও বিঘ্ন-বিপদেই যেন তাহারা ভীত না হয়। নামে যেন নির্ভর করে। আমার আদর্শে যেন বিশ্বাস রাখে। জানিও, আমি মেকী সোনার কারবার করি না।

চতুর্দ্দিকে সদ্‌ভাব প্রচার করিতে থাক। মানুষের অন্তরে ভক্তি, বিশ্বাস ও কর্ম্মঠতা জাগাইতে চেষ্টা কর। কর্ম্মে যাহাদের অরুচি,

তাহাদের ভক্তিবিশ্বাস ব্যক্তিগত জীবনের সম্পদ হইলেও জাতিগত দুর্ব্বলতার অপসারণে সহায়তা করে না। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(২১)

হরি-ওঁ

মঙ্গলকুটীর, পুপুন্‌কী
১৮ মাঘ, ১৩৭২

কল্যাণীয়াসু ঃ—

স্নেহের মা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তোমাদের একটী গুরুভগিনী নার্সের চাকুরী লইয়া ঠিক সেই চা-বাগিচাতেই আসিয়াছে, যেখানে তোমরা বাস কর, যেখানে তোমরা ভাই-বোনেরা মিলিয়া অনেক দিন হয় ক্ষুদ্র একটী অখণ্ড-মণ্ডলী স্থাপন করিয়াছ, যেখানে মণ্ডলীতে কোন ঝগড়া নাই, কলহ নাই, সকলেই চলে ঐক্যবদ্ধ হইয়া, এক লক্ষ্য লইয়া, এই সংবাদে বড়ই সুখী হইয়াছি। তোমাদের যে গুরুভগিনীটি দূরের সহর হইতে আসিয়া ক্ষুদ্র একটা চা-বাগিচার বস্তিতে তোমাদের সহযোগিনী হইল, তাহার যাহাতে কর্ম্মোৎসাহ, কর্ম্মোদ্দীপনা, কর্ম্মপ্রেরণা তোমাদের সাহচর্য্যে দিনের পর দিন বর্দ্ধিত হইতে থাকে এবং ঐ একটী মানুষ যাহাতে সহস্র সহস্র মানুষের দুঃখমুক্তির কারণ হইতে পারে, তোমরা তাহা করিও। আবার এই নবাগতা ভগিনীর চিন্তা, বাক্য, কর্ম্ম প্রভৃতি হইতে তোমরাও নূতন প্রেরণা, নূতন উদ্দীপনা, নূতন কর্ম্মৈষণা সংগ্রহ করিও। পরস্পর

পরস্পরকে শক্তিশালীনী, বীর্য্যবতী ও আকাশের ন্যায় অনন্ত উদার হইতে সহায়তা করিও। একে অন্যেব আর্থিক, সামাজিক, কায়িক, নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক শক্তি-বৃদ্ধিতে সহায়তা করিবে, ইহাই হইতেছে কাহাকেও গুরুভাই বা গুরুভগিনী বলিয়া সম্বোধন করিবার প্রকৃত অর্থ। পরষ্পর পরষ্পরকে হীনতা, নীচতা, দীনতা ও দুর্ব্বলতা হইতে রক্ষা করিবে, পরষ্পর পরষ্পরকে উন্নতির দায়িত্ব-জ্ঞানে উদ্বুদ্ধ করিবে, সকলের শক্তির সহিত সকলের সামর্থ্য সংযুক্ত করিয়া সমন্বিত এক মহাভুজবীর্য্যকে জগতের মহৎ কল্যাণে নিয়োজিত করিবে, গুরুভাই বা গুরুভগিনী বলিয়া কাহাকেও স্বীকার করিবার ভিতরে ইহাই রহিয়াছে রহস্য। এই রহস্যের প্রতি উদাসীন থাকিয়া চলিতে যাওয়া তোমাদের প্রত্যেকের পক্ষে এক অসাধারণ রকমের মূঢ়তা হইবে। আমি আশীর্ব্বাদ করি, তোমাদের প্রত্যেকের অন্তরে এই দায়িত্ব-চেতনা জাগিয়া উঠুক এবং তোমাদের সকলের সম্মিলিত শক্তি পৃথিবীর ইতিহাসে যুগের পর যুগ ধরিয়া নূতন নূতন গৌরবজ্জ্বল অধ্যায় সংযোজিত করুক।

যেখানে যে গুরুভাই বা গুরুবোন্ আছে, তোমরা তাহাদের সকলের মধ্যে সাধনের উদ্যম সৃষ্টি কর। সাধন করিলে জীবন সত্যময়, শান্তিময় ও দীপ্তিময় হইয়া উঠিবে। বিশ্বের সকলকে আনিয়া ভগবৎ-প্রেমের স্নিগ্ধ বন্ধনে বাঁধিয়া লইবার ভিতরে যে কৃতিত্ব আছে, রাজ্যজয়ে বা দিগ্বিজয়ে তাহা নাই। নিখিল ভুবন জুড়িয়া তোমরা ভগবৎ-প্রেমের প্লাবন সৃষ্টি কর। মহোৎসাহ সহকারে তোমরা মানুষের অন্তরের সুপ্ত দেবত্বকে জাগাইবার কাজে লাগিয়া যাও। আমার প্রত্যেকটী সন্তানের অন্তরে এই বিশ্বাস প্রতিষ্ঠিত করা প্রয়োজন যে, সে মহাকার্য্য সাধনের

জন্যই আসিয়াছে, হেলায় খেলায় জীবন বিতাইয়া দিবার জন্য নহে। তোমরা কদাচ আত্মবিশ্বাস হারাইও না। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(২২)

হরি-ওঁ

মঙ্গলকুটীর, পুপুন্‌কী

২৩শে মাঘ, ১৩৭২

৬।২।৬৬

কল্যাণীয়েষু ঃ—

প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

মঙ্গলবাঁধ আর শুধু একটা এম্‌ব্যাঙ্কমেন্ট মাত্রই নহে, এখন ইহার পূর্ব্বে ও পশ্চিমে সুপ্রশস্ত বারান্দার ব্যবস্থা হইতেছে, দক্ষিণাংশে ছাত্রদের জিনিষপত্র রাখিবার বিরাট ঘরটীর চারিদিকের দেওয়াল এবং দুইটী সিঁড়ি তৈরী হইয়া গিয়াছে। একটী সিঁড়ি দিয়া ছাত্রাবাসের বাসগৃহগুলিতে প্রবেশ করিতে পারা যাইবে, অপরটী দ্বারা সোজা দ্বিতলে। কাজ তিল তিল করিয়া আগাইতেছে, একটী দিনের জন্যও কাজ বন্ধ নাই। এ কাজ বন্ধ রাখিতে পারি না। এ কাজ জাতিগঠনের ভিত্তি-প্রতিষ্ঠার কাজ, এ কাজ মানুষ-সৃষ্টি করিবার বিরাট যজ্ঞায়োজনের বেদীমূল। সকল দিকের সকল চিন্তা গুটাইয়া নিয়া আমি আমার সমগ্র দেহমন ঐ এক কাজে নিয়োজিত করিয়াছি এই তৃপ্তিলোভে যে, একদা তাহা গড়িয়া উঠিবে, যাহা আমার কৈশোরের কল্পনা, যৌবনের স্বপ্ন, প্রৌঢ়ের সাধনা এবং বার্দ্ধক্যের সাফল্য।

শিক্ষায় স্বাধীনতাও চাই, স্বাবলম্বনও চাই। দেশ পরাধীন থাকা কালে দেশের নেতৃস্থানীয় চিন্তাশীল মণীষীরা শিক্ষায় স্বাধীনতার উপরে তীব্রভাবে চিন্তা করিয়াছিলেন, কিন্তু শিক্ষায় স্বাবলম্বন অবহেলিত হইয়া রহিয়াছে। আজ আবার শিক্ষার স্বাধীনতা হরণকে প্রায় প্রত্যেকটী প্রান্তেই রাজ্য-কর্ণধারেরা একান্ত কর্ত্তব্য বলিয়া জ্ঞান করিতেছেন। কোথাও কোথাও এমন নির্ল্লজ্জ আচরণ হইতেছে যে, বিচারালয়ের রায়ের পবিত্রতাকে লঙ্ঘন করিয়া রাজ্যপাল অর্ডিন্যান্স্ জারি করিয়া সরকারী কর্ত্তৃত্বকে শিক্ষা-ব্যবস্থার উপরে চালু রাখিতে চেষ্টিত হইতেছেন। এগুলি নিতান্তই দুর্ল্লক্ষণ। ইহার কুফলে স্বাধীন-চিন্তাপরায়ণ নাগরিকদের আবির্ভাব-সম্ভাবনা কমিয়া যাইবে, শিক্ষিত হইয়া মানুষ একটা দল-বিশেষের হাতের পুতুলে পরিণত হইবে। আমার বিশ্ববিদ্যাকেন্দ্র বা মালটিভারসিটি শিক্ষায় স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা করিবে, স্বাবলম্বনকেও ফুটাইয়া তুলিবে। কি করিলে স্বাধীনতা ধুলায় লুটায়, তাহা আমাদের জানা আছে। তেমন কুকাজ কদাচ আমরা করিব না।

কিন্তু তোমাদেরও এজন্য সজাগ, সতর্ক, সাবধান থাকা দরকার। তোমরা তোমাদের কর্ত্তব্য ভুলিতে পার না। তোমরা যদি তোমাদের দায়িত্ব ভুলিয়া যাও, তোমরা নিদারুণ ভুল করিবে। তোমরা যদি তোমাদের ব্যক্তিগত ব্যাপারগুলি লইয়া এত ব্যস্ত-বিব্রত থাক যে, দেশ, জাতি ও জগতের সুমহৎ ভবিষ্যৎ ভাবিবার তোমাদের অবসরই নাই, তবে তোমরা নিজেদের বংশধরদের কাছেই কর্ত্তব্যে অবহেলার দরুণ দায়ী হইবে।

ভাল কথা মনে পড়িল। হোজাইতে যে নিখিল-ভারত-অখণ্ড-মহাসম্মেলন হইতে যাইতেছে, তাহাতে কেহ মালটিভারসিটির সম্পর্কিত

টাকা-কড়ির আলোচনা তুলিতে পারিবে না, এই সর্ত্তে আমি হোজাইতে উপস্থিত থাকিতে সম্মতি জানাইয়াছি। আমি তোমাদের বহু দুর্ব্বলতার ন্যায় এই দুর্ব্বলতারও খোঁজ রাখি যে, অধিকাংশ অখণ্ড-প্রতিনিধি-সম্মেলনে তোমাদের অনেকেই যোগদান করে না শুধু এই আশঙ্কায়, কি জানি কে আবার সংঘের কোন্ কল্যাণ-কাজের জন্য টাকাকড়ি চাহিয়া বসে। দানশীলতার অভ্যাস না থাকিলে এতজ্জাতীয় দুর্ব্বলতা মানুষের মনে জাগিতে পারে। ইহা অস্বাভাবিক নহে। তোমরা অধিকাংশেই নিতান্তই দরিদ্র বলিয়া অবস্থার তাড়নাতেও যে এইরূপ দুর্ব্বলতার প্রভাবাধীন হও, তাহাও স্বাভাবিক। কিন্তু হোজাইতে অনুষ্ঠেয় মহা-সম্মেলনে তোমাদের আমি অত্যধিক সংখ্যায় দেখিতে চাহি। তোমরা সকলে একেবারে নির্ভয়ে, একেবারে নিঃসঙ্কোচ হইয়া সেইখানে আস, আমি ইহা চাই। দানশীলতার প্রয়োজনীয়তা বাদে অন্যান্য অনেক অত্যাবশ্যকীয় বিষয় সেখানে আলোচিত হইবে। সেই সকল আলোচনায় যোগদান, তাহা শ্রবণ ও তদ্বিষয়ে মনন করিবার সুযোগ হইতে কেন তোমরা অন্ধ দানভীতি হেতু নিজেদিগকে বঞ্চিত করিবে? আমি আজীবন অযাচক থাকিবার চেষ্টা করায় তোমরা নিজেরা যতটা স্বাবলম্বী হইয়াছ, তার চেয়ে বেশী হইয়াছ অদাতা,—এইরূপ অভিযোগ তোমাদের মধ্যেই অনেককে করিতে শুনি। কিন্তু হোজাই সম্মেলনে কাহারও দাতৃত্বের বা অদাতৃত্বের কোনও প্রসঙ্গই উঠিবে না, মালটিভারসিটির জন্য আর্থিক সংস্থান করার প্রয়াস সম্পর্কে কোনও আলোচনাই হইবে না, হইবে তোমাদের অত্যধিক প্রয়োজনীয় অন্যান্য বহুবিধ বিষয়ে। অদাতৃত্ব-স্বভাব-বশতঃ বা সাংসারিক দৈন্য-দশা-বশত একজনেও এই মহাসম্মেলনে যোগদানের সুযোগ ছাড়িও না। ইহাকে তীর্থযাত্রা মনে

করিবে। তীর্থের ক্লেশ এবং পুণ্য উভয়ই এখান হইতে তোমরা আহরণ করিয়া নিয়া যাইও।

হোজাই মহাসম্মেলনে আরও একটী নূতন প্রস্তাব আলোচিত ও গৃহীত হওয়া প্রয়োজন। পরিবার-পরিকল্পনা নাম দিয়া জন্মনিরোধের যে কৃত্রিম আন্দোলন সরকারী অর্থের অপচয়ে সমগ্র দেশ জুড়িয়া চলিতেছে, অখণ্ডগণকে তাহার সংস্রব ও প্রভাব হইতে সযত্নে দূরে থাকিতে হইবে। অখণ্ডগণ সংযমের সাধন করিবে, সংযম-বলে স্বাভাবিক পথে জন্মনিয়ন্ত্রণ চলিবে, কৃত্রিম, অস্বাভাবিক, সন্নীতি-বিগর্হিত সদ্‌রুচি-বিরুদ্ধ কোনও আচরণের প্রশ্রয় নিজেদের পরিবারে দিবে না। ঐ সর্ব্বনাশা আন্দোলন যে জাতির নৈতিক শক্তির নাশ করিবে, বুদ্ধির প্রখরতা-হ্রাস করিবে, ঘরে ঘরে অজানা অচেনা নূতন নূতন যৌন রোগের সৃষ্টি করিবে, কোনও কোনও স্থলে ক্যান্‌সার রোগের জনক হইবে, বুদ্ধিহীন নেতারা তাহা বুঝিতে পারিতেছেন না। জীবনের গোড়ায় যে শিক্ষা ও সংযম থাকিলে এই বিষয়ে দূরদৃষ্টি জন্মিতে পারে, সেই শিক্ষা ও সংযম কয়জন নেতার লাভ করিবার সুযোগ হইয়াছে? তোমরা এই একটী অতীব গুরুতর বিষয়ে এখন হইতেই সতর্ক হইয়া যাও। পরিবার-পরিকল্পনা অনুযায়ী লজ্জাকর কাণ্ডগুলি করিয়া যাহারা সন্তান পাইবার দায় হইতে মুক্ত হইয়াছে, তাহারা কত কত জনে রুগ্ন হইয়া আমার কাছে যদি কাতর কণ্ঠে দুঃখ-বর্ণনা না করিত, তবে হয়ত এই বিষয়ে একেবারে খড়্গহস্ত হইবার আমার তেমন প্রেরণা আসিত না। অখণ্ডেরা স্বভাবের নিয়মে চলিবে, যৌন-বাসনার কৃত্রিম দাসত্বের অধীন হইয়া নহে।

সরকারী পরিবার-পরিকল্পনার উদ্দেশ্য যাহাই হউক, বিধেয়

দাঁড়াইতেছে নরনারীকে অবাধ অকুণ্ঠ যৌন-সম্ভোগের দায়িত্বহীন ছাড়পত্র দেওয়া। এই পথে কোনও মহাজাতির আবির্ভাব ঘটে না, ঘটে অধঃপতন। এই ভ্রান্ত পথকে নামজাদা লোকেরা জয়ঢক্কা বাজাইয়া প্রশংসা করিতেছেন বলিয়াই ইহা আমাদের অনুমোদন পাইতে পারে না। ইংরাজের দাসত্ব অপেক্ষাও দেশবাসীকে অসচ্চিন্তার দাসত্বে যে বেশী করিয়াই আড়ষ্ট করিয়া ফেলিতেছে, এইগুলি তাহারই জাজ্জ্বল্যমান প্রমাণ। তোমরা অধোগতিকে উন্নতি বলিয়া ভ্রম করিও না। অগতিকে প্রগতি ভাবিও না, আত্মবিনাশকে নবজীবন বলিয়া স্বীকার করিও না। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(২৩)

হরি-ওঁ

কোয়েলওয়ার (শাহাবাদ)
মঙ্গলবার, ৩রা ফাল্গুন, ১৩৭২
১৫।২।৬৬ ইং

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশীস নিও।

পরমেশ্বর যেরূপ ব্যবস্থা করেন, তাহাই হয়। পরমেশ্বরের পরম ইচ্ছাকে সত্য ও নিত্য জানিয়া তাহার জন্য তৈরী থাকিতে হয়। দেখ, আসিব ড্যালমিয়ানগরের নূতন শোন-সেতুর উপর দিয়া, আর রাস্তা ধরিতে হইল পাটনার। বিকাল চারিটার মধ্যে পাটনা পৌছিবার কথা কিন্তু তাহার অনেক আগেই সাসারাম-আরা রাজপথের এক নিরালা

অঞ্চলে আসিয়া গাড়ীর এ-সি-পাম্প বিগড়াইল। শ্রীমান অনিল বেশ দুই-আড়াই ঘন্টা অনেক চেষ্টা করিল কিন্তু পেট্রোল পাস করিল না। ঝিরঝিরা বৃষ্টিতে দাঁড়াইয়া টর্চ্চ ধরিতে ধরিতে আমার শরীরে ক্লান্তি আসিয়া গেল। সাধনা বলিল,—"তবে কি হইবে?" আমি বলিলাম,—"ভালই হইবে, চিন্তার কিছু নাই, সাহস সঞ্চয় করিয়া থাকিতে হইবে, কারণ স্থানটা অতীব কুখ্যাত।" অন্ধকার ঘনাইয়া আসিয়াছে। যখন প্রায় সকল্ আশা ছাড়িয়া দিয়াছি, এমন সময় হঠাৎ একখানা জীপ্ থামিল। যাত্রীরা সংখ্যায় জনা দশেক, প্রত্যেকেই বঙ্গভাষী। তাঁহারা অবস্থা দেখিয়া প্রস্তাব করিলেন যে, আমাদের গাড়ীখানা টানিয়া নিয়া ছোট লাইনের বিক্রমগঞ্জ রেলষ্টেশনে পৌছাইয়া দিবেন। নিজেরা সেই অন্ধকারে সেই ঝিরঝিরা বৃষ্টিতে নামিয়া দাঁড়াইলেন। আমি আমার ছাতা দুইটা রাখিয়া গেলাম যেন তাঁহাদের কাজে লাগে। বিক্রমগঞ্জ গিয়া দেখিলাম কেবল রেলষ্টেশনই নহে, ইহা বেশ একটা বাজার। একজন মোটর-মেকানিক মিলিয়া গেল। তিনি অনেক চেষ্টা করিয়া এ-সি পাম্প মেরামত করিলেন। দক্ষিণা মাত্র সাতটী টাকা দিতে হইল। ঘন্টা তিনেক অন্ধকারে বসিয়া থাকিতে হইল। মশার কামড়ে আমার ও সাধনার শরীর স্ফীত হইয়া গেল। একটা পানের দোকানে গিয়া এক প্যাকেট আগর-বাতি (ধূপকাঠি) কিনিয়া তাহা জ্বালাইয়া জ্বালাইয়া মশা তাড়াইতে লাগিলাম, যতক্ষণ এ-সি পাম্প মেরামত চলিল। রাত্রি প্রায় একটার সময় কোয়েলওয়ার পৌছিলাম। গৃহস্থকে জাগাইলাম এবং লেপ মুড়ি দিয়া নিদ্রাদেবীর আশ্রয় নিলাম। এখন সকাল হইয়াছে। স্নান সারিয়াছি। আহার করিয়াই ছুটিব পাটনা

এবং তৎপর পুপুন্‌কী। দুরন্ত কর্ম্ম পুপুন্‌কীতে নিরন্তর আমাকে ডাকিতেছে, আবার অফুরন্ত বিশ্রাম দূর দেশ হইতে আমাকে হাতছানি দেখাইতেছে। কর্ম্ম ও বিশ্রামের যুগপৎ এই দাবীর সামঞ্জস্য কোথায়? একমাত্র কর্ম্মান্তর পরিগ্রহণে। কাজ ছাড়িয়া দিয়া বিশ্রাম হয় না, কাজ করিয়াই বিশ্রাম পাইতে হয়। আমি বিশ্রাম চাহি না কিন্তু শরীরের অস্থি, মাংস, রস, রক্ত, মজ্জা সকলেই স্বাভাবিক নিয়মে বিশ্রামের জন্য কাতর। কিন্তু কোথায় বিশ্রাম, কবে বিশ্রাম? তোমাদের প্রত্যেকের দারিদ্রের মূল কারণ যাহা, তাহাকে কি তোমরা চিনিতে পারিয়াছ? কেন আমি স্বাবলম্বনের বজ্রবাণী কম্বুকণ্ঠে অর্দ্ধশতাব্দী ধরিয়া প্রচার করিয়া যাইতেছি, তাহার তাৎপর্য্য তোমরা কি কেহ বুঝিয়াছ? তোমরা কি অনুভব করিয়াছ,আকৈশোর কেন আমি সুস্থাবস্থায় জীবনে একটী দিনও চারিঘন্টার বেশী ঘুমাই নাই? তোমরা কি আমার জীবনের ব্রত, জীবনের লক্ষ্য এবং জীবনের গতি কেহ অনুধাবন করিবার চেষ্টা করিয়াছ? গুপ্তঘাতকের ছুরিকা যাহার পিছে পিছে ছুটিতেছে, বিষ-প্রয়োগকারীর খাদ্য পানীয় নিয়ত যাঁহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইতেছে বিষাক্ত সূচিকা বিদ্ধ করিয়া যাহার কর্ম্মঠ দেহকে অকর্ম্মণ্য করিবার কয়বার চেষ্টা হইয়াছে, শোভাযাত্রাকালে যাহার মস্তক লক্ষ্য করিয়া কতবার প্রস্তর নিক্ষিপ্ত হইয়াছে, নিভৃত পল্লীনিবাসে যাহাকে বাসগৃহ-মধ্যে জ্বলন্ত দগ্ধ করিয়া মারিবার বিফল চেষ্টা অন্ততঃ পাঁচবার হইয়াছে, তোমরা কি ভাবিয়া দেখিয়াছ, কেন সে এখনও বিশ্রাম চাহে না, কেন সে এখনও নিজেকে দুরন্ত পরিশ্রমে ডুবাইয়া দিতে পায় আনন্দ?

এগুলি তোমরা ভাব নাই। এইজন্যই তোমরা আমার কাজে নিজেদিগকে প্রসঙ্গ, সংলগ্ন বা একাঙ্গ করিতে পার নাই। আমি তোমাদিগকে যতই নিকট করিতে চাহিতেছি, ততই তোমরা দূরে দূরে সরিয়া যাইতেছ। আমার গায়ের ছোঁয়াচ লাগিলে তোমরা মুক্ত হইতে, অমর হইতে কিন্তু তোমরা মুক্তিও চাহ না, অমৃতত্বও চাহ না, চাহ শুধু কূপমণ্ডুকের অর্থ-তাৎপর্য্য-বর্জ্জিত ভিত্তিহীন আত্মতুষ্টি। তোমাদের এই কূপমণ্ডুকতার সৃষ্টি যে অপ্রেম হইতে, একথা তোমরা কবে বুঝিবে? কবে তোমরা প্রেমিক হইবে, দরদী হইবে, অনুভূতিশীল হইবে?

এখনও সময় আছে। মধ্যাহ্ন-সূর্য্য অস্তাচল-চূড়াবলম্বী হইলেও মরণ-পাহাড়ের বিস্তৃতির ছায়ায় এখনও ডুবিয়া যায় নাই। যার ঘর ছাইবার প্রয়োজন, এখনও সে উদ্যোগী হইতে পারে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(২৪)

হরি-ওঁ

মঙ্গলকুটীর, পুপুন্‌কী
সোমবার, ১৬ই ফাল্গুন, ১৩৭২
২৮-২-৬৬ ইং

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তোমার পত্র মনোযোগের সহিত পড়িয়াছি। তুমি যে প্রস্তাবটীর

কথা লিখিয়াছ, তাহা নিয়া হোজাইতে আলোচনা না হওয়াই ভাল। সমবেত উপাসনা কালে লোকে প্রণামী দেউক, এইরূপ কামনা তোমাদের থাকা উচিত নহে। আমার প্রবর্ত্তিত সমবেত উপাসনার নিয়মই এই যে, সকলকে কিছু না কিছু উপাসনার উপচার আনিতে হইবে, কেহ দূর্ব্বা, কেহ বিল্বপত্র, কেহ পুষ্প ইত্যাদি। ইহার অপর বিশেষত্ব এই যে, উপাসনাকালে একজনই বিশ্বজনের হইয়া উপাসনা করিতেছে, বিশ্বজনই এক এক জনের মধ্য দিয়া পরমেশ্বরে নিজেদের প্রেম নিবেদন করিতেছে। শুদ্ধ মন, শুদ্ধ প্রাণ লইয়া সকলে যদি উপাসনাটীতে নিয়মিত আসে এবং যোগ্য মনোভাব নিয়া উপাসনা করে, তাহা হইলে আধার অনুযায়ী ত্যাগ, তিতিক্ষা, বৈরাগ্য ও জগৎকল্যাণকল্পে আত্মোৎসর্গের প্রেরণা আপনা আপনি জাগিবে। "উপাসনায় আসিয়াছ, বিগ্রহ-প্রণামী দিলে না",—এই ভাব লইয়া কাহারো পানে তাকাইও না। মণ্ডলীতে উপাসনার পর অঞ্জলি-অন্তে বিগ্রহের উদ্দেশ্যে কেহ কেহ কিছু কিছু প্রণাম করিয়া দেয়, কেহ কেহ ইহাকে অন্ধ কুসংস্কার মনে করিয়া কিছুই দেয় না, এই উভয় অবস্থার প্রতিই তোমরা একেবারে উদাসীন হও। উপাসনার পর বিগ্রহ-প্রণামীকে বাধ্যকর করিতে গেলে কালক্রমে একশ্রেণীর পৌরহিত্য-তন্ত্র মাথা উঁচু করিতে পারে। উপাসনার মধ্য দিয়া সমগ্র মানব-জাতির ঐক্য, সংহতি, সমবেদনা ও আত্মীয়তা প্রতিষ্ঠিত হউক,—ইহাই তোমাদের হউক কাম্য। অন্তরের প্রগাঢ় প্রেমই বড় কথা। প্রেম না আসিলে কোনও নিয়মই নিয়ম নহে। প্রেম আসিলে তাহার প্রকাশ

শত দিকে শত মুখে হয়, সে নির্দ্দিষ্ট ধরা বাঁধা গলি ধরিয়া চলে না। নিজে প্রেমিক হও ও সকলকে প্রেমিক কর। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(২৫)

হরি-ওঁ

মঙ্গলকুটীর
শনিবার, ২১শে ফাল্গুন, ১৩৭২
৫-৩-৬৬ ইং

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা,— প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

অনেক দিন পরে পূর্ব্ববঙ্গ হইতে তোমাদের পত্র পাইয়া বড়ই আহ্লাদিত হইয়াছি। তোমরা প্রত্যেকে নিরাপদে থাক, নিরন্তরই এই আশীর্ব্বাদ করিতেছিলাম। রাজনীতি যখন সাম্প্রদায়িকতার সহিত মিলিত হয়, তখন কত যে অকল্পনীয় ঘটনা ঘটিতে পারে, বলিবার নহে। বুদ্ধিমান লোকেরা রাজনীতি ও সাম্প্রদায়িক চেতনা এই দুইটি জিনিষকে আলাদা রাখিতে চেষ্টা করিয়াছেন, অল্পবুদ্ধি ব্যক্তিরা এই দুইটীকে একত্র করিয়া জগাখিচুড়ি পাকাইয়াছেন,—আর যাঁহারা অকাট-মূর্খ ও অকাল-কুষ্মাণ্ড, তাঁহারা রাজনীতি হইতে সাম্প্রদায়িকতাকে দূরে রাখিবার নাম করিয়া এমন সকল কাণ্ড করিয়াছেন, যাহাতে যে সম্প্রদায়ে তিনি জন্মিয়াছেন, তাহা হইয়াছে নির্য্যাতিত এবং যে সম্প্রদায়ে তিনি জন্মেন নাই, তাহা হইয়াছে অন্যায় এবং অধর্ম্মে প্রশ্রয়পুষ্ট। মানুষ

মানুষকে মানুষ বলিয়া সম্মান করিবে, ইহার চাইতে বড় কথা আর কিছু নাই। মানুষকে সম্প্রদায়ের চিহ্নে চিহ্নিত করিয়া বিচার করিলে সে ছোট হইয়া যায়; কেননা, আগে সে হিন্দু, মুসলমান বা খৃষ্টান, তারপরে ত' সে মানুষ! সকল মানুষের সহিত মিলিয়া যাইবার স্বাভাবিক সুযোগটুকু তাহার কমিয়া যায়, সকল মানুষের সহিত সমান হইবার স্বাভাবিক সামর্থ্য তাহার নিস্তেজ হইতে থাকে। নিষ্প্রভ ও পরিম্লান মনুষ্যত্ব লইয়া কে পারিবে সকলকে আপন করিতে? সর্ব্বসম্প্রদায়ের ভিতরে মানুষ নামে যে একটী সর্ব্বসামান্য সম্প্রদায় রহিয়াছে, তাহাকেই দিতে হইবে বড় পীড়ি। যাহারা আগে মানুষ, পরে হিন্দু, মুসলমান বা খৃষ্টান, তাহাদের ধর্ম্মবল তাহাদিগকে অপরকে শত্রু ভাবিতে বাধা দেয়। সর্ব্বজীবে তাহাদের ভালবাসা অটল ও অবাধ হয়। সেই মানুষগুলির দিকে তাকাইয়াই জগতের অধিকাংশ মণীষী কতকাল ধরিয়া সুদীর্ঘ প্রতীক্ষার দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়াছেন। সেই মানুষগুলিকে আজ খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে।

তোমাদের সমবেত উপাসনা পূর্ণোদ্যমে চলিয়াছে জানিয়া সুখী হইয়াছি। এখন কেহ বুঝুক আর না বুঝুক, তোমরা বিশ্বাস করিও যে, নূতন সম্প্রদায় সৃষ্টি করিয়া জগদ্বাসীকে জ্বালাতন করিবার জন্য আমাদের সমবেত উপাসনার জন্ম হয় নাই। যত সম্প্রদায়ের যে আছে, সকলে যাহাতে মিলিতে পারে, এইজন্য আমি পূজালাভের বেদীতে না বসিয়া পূজকের আসনে বসিয়াছি তোমাদের সমসাধক হইয়া। নিজেকে বিলুপ্ত করিয়া দিলে বিশ্বের সকলকে আমি আমার স্পর্শ-পরিধির মধ্যে পাইব, ইহাই আমার সর্ব্বতোগরীয়ান্ আত্মপ্রসাদ।

অন্যত্র দেখিতেছি, গুরুদেবেরা স্বতঃ পরতঃ নিজেকে পূজিত করিবার জন্য কত-কিছু করিতেছেন; কেহ কেহ অতটা না আগাইলেও নিজেকে পূজিত হইতে দেখিলে খুশী হইতেছেন। ইহা তাঁহাদের দোষ বা গুণ, তাহার বিচার আমি করিতেছি না। কিন্তু আমি যদি পূজিত হইতে চাহি, তবে যে আমি আনেকের বক্ষপরশ হইতে বঞ্চিত হইব, ইহা আমি বুঝিয়াছি। সকলকে যখন চাই, তখন উঁচু হইবার আমার প্রয়োজন নহে, সমান হইবারই প্রয়োজন। সমবেত উপাসনায় আমি তোমাদের সমান হইয়াছি এবং "সমানো মন্ত্রে" বিশ্বের সকলকে লইয়া বিশ্বেশ্বরের আরাধনা করিতেছি,—একাকী নিজের কুশলের জন্য নহে, তোমাকে, আমাকে এবং অপর দুই চারিজনকে লইয়া আমার যে ক্ষুদ্র গোষ্ঠী একমাত্র তাহারই কল্যাণের জন্য নহে, পরন্তু কোটি কোটি বিশ্বের লক্ষ কোটি অধিবাসীর মঙ্গলের জন্যই এই উপাসনা। এই পুণ্যজনক অনুষ্ঠানটি তোমরা যত করিবে, যতখানে করিবে, যতজনে করিবে, ততই আমার আনন্দ। মহাবলের উৎসস্বরূপ এই অনুষ্ঠানটীকে কদাচ তোমরা শ্রদ্ধাহীন দৃষ্টিতে দেখিও না। যে আমার প্রিয়, সে আমার পরমপ্রিয় এই অনুষ্ঠানকে অবহেলা করিতে পারে না। অন্য ভাষায় বলিতে গেলে, আমি যার প্রিয়, সে কখনো সমবেত উপাসনার প্রতি অমনযোগী হইতে পারে না। সমবেত উপাসনার মধ্য দিয়া তোমরা ঐক্য এবং নম্রতাকে, সংহতি এবং শৃঙ্খলাকে, আদর্শের প্রতি আনুগত্য এবং পরার্থে আত্মত্যাগকে তোমাদের দ্বিতীয় স্বভাবে পরিণত কর।

পৌষ মাসে আমার জন্মোৎসব করিতে পার নাই বলিয়া দুঃখ

করিও না। একা একজনে লাখ টাকা খরচ করিতে পারিল না বলিয়া বা একা একজনে নিজ প্রতিভার তোড়ে সকল বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া তীরে নৌকা ভিড়াইতে পারিল না বলিয়া জন্মোৎসব হইল না, আমার জন্মোৎসব এমন ব্যাপার নহে। ক্ষুদ্র তুচ্ছ সাধারণ দুইটী মানুষ কয়েক গুচ্ছ দুর্ব্বা হাতে লইয়া পরমপুরুষের নামে অঞ্জলি দিতে পারিলেই আমার জন্মোৎসব হইয়া গেল। আমাকে একটা কৃষ্ণ বা বিষ্ণু ঠাওরাইয়া তোমরা আমার জন্মদিবস পালন করিতে যাইও না। আমি যে তোমাদেরই মধ্যে একজন, এই কথা স্মরণে রাখিয়া স্বল্প আড়ম্বরে কাজ করিও। তাহা হইলেই কাহারো স্বার্থপরতা বা অজ্ঞানান্ধতা তোমাদের অভিলষিত অনুষ্ঠানের কিছুমাত্র বাধা সৃষ্টি করিতে পারিবে না। এই শরীরটা ভূমিষ্ঠ হইয়াছিল মহাদুর্য্যোগের মধ্য দিয়া, যাহার ফলে ভূমিষ্ঠ হইবার পর পিতামহ তাঁহার বড় আদরের ধন প্রথম পৌত্রের জন্ম-সংবাদটী সাত দিন ধরিয়া চাপিয়া রাখিয়াছিলেন। সপ্তাহান্তে যখন দেখা গেল, যে জীবন্ত মাংসপিণ্ডটার জন্মমাত্রই মৃত্যু হইবার কথা ছিল, তাহা সাত দিন টিকিয়া গেল, তখন অষ্টম দিবসে তিনি পৌত্রের আবির্ভাব-সংবাদ ঘটা করিয়া প্রচার করিলেন। দীন-দুঃখী-দরিদ্রেরা ভুরি-ভোজন করিল সেই অষ্টম দিবসে, বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণেরা পণ্ডিত-বিদায় গ্রহণ করিলেন সেই অষ্টমাহে। সুতরাং জন্মদিনেই তোমরা জন্মোৎসব করিতে পার নাই বলিয়া লজ্জিত, দুঃখিত বা কুণ্ঠিত হইবার প্রয়োজন নাই। এবার পার নাই, আগামীবার করিবে। সকলকে একত্র পাইলে না, বেশ! যে দুই তিন চারিজন এই ব্যাপারটীকে নিজেদের আত্মিক ও নৈতিক উন্নতির পক্ষে সহায়ক

মনে করে, মাত্র সেই কয় জনকে নিয়াই অনুষ্ঠানটী কর। ইহাতে যদি তোমাদের নিজেদের বা জগদ্বাসী কিছু লোকের বিশেষ লাভ আছে বলিয়া মনে কর, তবে নিঃসঙ্কোচে ইহা কর। শুধু প্রথা-রক্ষার জন্য কিছু করিও না। গতানুগতিক সৎকর্ম্মেও অনেক সময় দুর্ব্বলতার বীজবপন হইয়া যায়। প্রাণের আবেগ থাকিলে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কোনও সত্যিকার আধ্যাত্মিক লাভ থাকিলে জন্মোৎসব করিবে। কোন্‌টী লাভজনক, কোন্‌টী অলাভজনক, তাহার বিচার করিবার কালে স্থিরবুদ্ধি, ধীরমতি এবং পুংখানুপুংখরূপে বিচারশীল হইবে। চিলে কাণ নেওয়ার মত ব্যাপার হইলে শ্রম ও অর্থ সবই বিফলে যাইবে, জীবনের পরমায়ুর কতকটুকু মূল্যবান অংশ বিনালাভে বিতহিয়া যইবে। জন্মোৎসব করিবে? বেশ, কর। কিন্তু আগে নিজেদিগকে জিজ্ঞাসা কর, ইহার উপকারিতা কি, উপযোগীতাই বা কি। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(২৬)

হরিওঁ

মঙ্গলকুটীর

রবিবার, ২২ ফাল্গুন, ১৩৭২

৬।৩।৬৬

কল্যাণীয়েষু:—

স্নেহের বাবা,—প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তোমার পিতৃদেব একান্ত ভাবে আমার প্রতি অনুরক্ত ছিলেন এবং

তিনি লালা হাইলাকান্দি শিলচর যখন যেখানে আমার যে ভাষণটী হইয়াছে, তাহা শুনিবার জন্য সর্ব্বকর্ম্ম ফেলিয়া ছুটিয়া আসিতেন, ইহা আমি জানি। চতুর্দ্দিকে গুরুবর্গের দিকে তাকাইয়া তিনি বলিতেন, "নিতান্ত লঘুকে গুরু বলিয়া স্বীকার করিয়া নিজেকে লঘুতর করিব কেন?"— ইহাও আমি জানি। অখণ্ড ভাবধারার প্রতি তাঁহার শুধু যে সুগভীর শ্রদ্ধা ছিল, তাহাই নহে, প্রগাঢ় বিশ্বাসও ছিল এবং আগামী কয়েক মাসের মধ্যে নিশ্চিত তিনি নিজেকে একজন পূর্ণাঙ্গ অখণ্ড ও সর্ব্বাঙ্গসুন্দর অখণ্ডাচারী করিয়া গড়িয়া তুলিতেন, ইহাতে কোনও সন্দেহ নাই। মৃত্যুকালে তিনি হরিওঁ জপিতে জপিতে মহাপ্রয়াণ করিয়াছেন এবং অখণ্ড-মতে শ্রাদ্ধাদি কার্য্যানুষ্ঠান করা হউক, এই নির্দ্দেশ দিয়া গিয়াছেন, ইহা শুনিয়া বিন্দুমাত্র বিস্ময় অনুভব করি নাই। কৌলিক লোকাচারের ঠুলি দিয়া বিবেককে ঢাকিয়া রাখিয়া চলিতে যাহারা অক্ষম, এমন সত্যনিষ্ঠ, বিচার-পরায়ণ ব্যক্তির পক্ষে এইরূপ বলা স্বাভাবিক। তিনি যদি অখণ্ড-আদর্শে মহত্তর বস্তুর সন্ধান না পাইতেন, তাহা হইলে এইরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিতে পারিতেন না।

তুমি চাহিয়াছিলে তাঁহার অভিলাষ পূর্ণ করিতে। কিন্তু তোমার স্বজাতীয় গুরুভাইদের দ্বারা অধ্যুষিত যেই দুইটী অখণ্ড-মণ্ডলীর উপরে তোমার নির্ভর ছিল, তাহারাই তোমাকে কেহ দিল বাধা, কেহ বা দিল জগাখিচুড়ীর বিধান। বলিতে হইবে, তোমার পিতৃদেব নৈষ্ঠিক ভাবে অখণ্ড-দীক্ষায় দীক্ষিত না হইলেও এই সকল তথাকথিত প্রাচীন অখণ্ড অপেক্ষা মহত্তর অখণ্ড। সম্প্রতি নিলামবাজার অঞ্চলে বিদ্যানগর-নিবাসী রাজেশ রায়, রণজিৎ রায়, রথীন্দ্র রায়, ঋতেন্দ্র রায়, হৃষিকেশ রায় এই পঞ্চভ্রাতার এক পত্র পাইলাম যে, তাঁহারা

পিতৃনির্দ্দেশ ক্রমে তাঁহাদের স্বর্গীয় পিতার শ্রাদ্ধকার্য্য সম্পূর্ণতঃ অখণ্ড-মতে করিয়াছেন। ইঁহাদের গোষ্ঠীতে একটী ব্যক্তিও অখণ্ড-দীক্ষায় দীক্ষিত নহেন। ইঁহাদের স্বর্গীয় পিতৃদেবও অখণ্ড ছিলেন না। কিন্তু সুদূর হইতে অখণ্ড-আদর্শের মধুর মুরলীধ্বনি তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিয়াছিল। ফলে তিনি হরিওঁ মহামন্ত্র উচ্চারণ করিতে করিতে পঞ্চভূতের মায়া কাটাইয়াছিলেন। পুত্রেরা তাঁহার অভিপ্রায়-পূরণে সাগ্রহে প্রস্তুত হইয়াছিলেন। নিলামবাজারের অখণ্ড-মণ্ডলী কায়মনোবাক্যে এই অনুষ্ঠানে সহযোগিতা করিয়াছিলেন। আর, তোমার ওখানে অখণ্ড-মতে শ্রাদ্ধের সাধু প্রস্তাব উত্থাপিত হইলে ভয় দেখান হইল দাঙ্গার। ইহা গুণ্ডামি ছাড়া আর কিছুই নহে।

যাহা হউক, এই ব্যাপার নিয়া মনে দুঃখ রাখিও না। তুমি তোমার সমগ্র জীবন অখণ্ড-আদর্শের প্রচারের জন্য উৎসর্গ কর। পিতা যাহা সত্য বলিয়া জানিয়াছিলেন, পুত্র তাহাকে নির্ভয়ে নিঃসঙ্কোচে নিখিল বিশ্বে প্রচার করিবে, ইহার নাম শ্রাদ্ধ। তুমি অখণ্ড হওয়া সত্ত্বেও, তোমার স্বর্গীয় পিতার সুস্পষ্ট অভিপ্রায় থাকা সত্ত্বেও, যাহারা তোমার পিতৃশ্রাদ্ধ অখণ্ড-মতে করিতে দিল না, বুদ্ধি দিল জগাখিচুড়ি পাকাইবার, প্রতিনিবৃত্ত করিল মারিবে, কাটিবে, ঘরে আগুন লাগাইবে বলিয়া, আমৃত্যু তোমাকে তাহাদের মূঢ়তা এবং অন্ধতা বিদূরণের জন্য সর্ব্বশক্তি প্রয়োগ করিতে হইবে। কাহারো চুল পাকিলেই সে প্রাচীন হয় না, কেহ দশ বা বিশ বছর আগে দীক্ষা নিলেই সে প্রাচীন হয় না, কেহ সভাস্থলে দাঁড়াইয়া উচ্চ ভাষণে করতালি কুড়াইতে পারিলেই প্রাচীন হয় না,—প্রকৃত প্রাচীনত্ব আদর্শ-নিষ্ঠার গভীরতায়। শূদ্রের প্রাচীনত্ব বয়সে, বৈশ্যের প্রাচীনত্ব ধনৈশ্বর্য্যে, ক্ষত্রিয়ের প্রাচীনত্ব

বাহুবলে ও পৌরুষে, ব্রাহ্মণের প্রাচীনত্ব জ্ঞানে ও তত্ত্বোপলব্ধিতে। অখণ্ড একাধারে ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণ। অখণ্ডের ভিতরে যুগপৎ চাই ক্ষত্রিয়ের শৌর্য্য এবং ব্রাহ্মণের তত্ত্বজ্ঞতা। এমন ব্যক্তিকেই প্রাচীন বলিয়া জ্ঞান করিও। যাহারা তোমার বিরোধ করিয়াছে, তাহাদের বংশধরদের মধ্যে আজই কাজে লাগিয়া যাও। পিতামহ আজ বাধা দিয়াছে, পৌত্র-প্রপৌত্রের মধ্যে তুমি তোমার বিদ্রোহের বীজ বপন কর। যুদ্ধ তুমি নিজে ঘোষণা কর নাই, ঘোষণা করিয়াছে ইহারা। সেই ঘোষণার সমুচিত উত্তর ইহাদের পৌত্র-প্রপৌত্র প্রভৃতির কণ্ঠে, বাহুতে, জীবনের আচরণে প্রদত্ত হউক। আজিকার দুর্ঘটনা ঘটনাই নহে,—তিনশত বৎসরের পরের ভারতবর্ষের দিকে তাকাও।

হোজাইতে মহাসম্মেলন হইতে যাইতেছে। সেখানে অনেক ছদ্মবেশী অখণ্ডের আগমন হইবে, যাহারা দুইদিকের নেতৃত্ব যুগপৎ বজায় রাখিবার জন্য গাছেরও পাড়িবেন, তলারও কুড়াইবেন। এমন ব্যক্তিরা যে অখণ্ডই নহেন, একথা স্পষ্টরূপে বুঝিবার এবং বুঝাইবার প্রয়োজন আসিয়াছে। দুই নৌকায় যাহার পা, সে নেতা হইবার যোগ্য নহে। অখণ্ডগণের তাহাকে মানিবার কোনও প্রায়োজন নাই। কিন্তু গায়ে পড়িয়া কদাচ কোনও সম্মানী লোকের মানহানি করিও না। জীর্ণ মন্দির-চূড়াগুলিকে আপনা আপনি ধূলিস্যাৎ হইতে দাও, তোমার তাহাতে আঘাত হানিবার জরুরী আবশ্যকতা কি? ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(২৭)

হরি-ওঁ

মঙ্গল কুটীর

রবিবার, ২২শে ফাল্গুন, ১৩৭২

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশীস জানিও।

একজন অখণ্ড যখন অখণ্ড-আদর্শের শ্রেষ্ঠত্বে পূর্ণ বিশ্বাসী হইয়া অখণ্ডমতে শ্রাদ্ধ বা বিবাহাদি কার্য্য করিতে চাহে, সেই সময়ে অখণ্ড মাত্রেরই কর্ত্তব্য হইবে তাহাকে কায়িক, বাচিক, নৈতিক ও আর্থিক সহায়তা প্রদান করা। সম্প্রতি অখণ্ড-মতে শ্রাদ্ধ নানা স্থানে হইতেছে, অখণ্ড-মতে বিবাহও। কোনও কোনও স্থানে অখণ্ড-মতে এমন বিবাহও হইয়াছে, যেখানে পাত্র বা পাত্রীর মধ্যে একজনেও অখণ্ড-মতে দীক্ষিত নহে। আর সম্প্রতি তোমাদের জেলাতেই বিদ্যানগরে এক প্রসিদ্ধ পুরুষ মৃত্যুকালে পুত্রদের নির্দ্দেশ দিয়া গেলেন যে, অখণ্ড-মতেই শ্রাদ্ধ করিতে হইবে,—এবং পাঁচটী সুশিক্ষিত রত্নস্বরূপপুত্র সমাজ-বাধার সম্ভাবনার দিকে না তাকাইয়া নিঃসঙ্কোচে সেই আদেশ পালন করিলেন। ইহারা একজনেও অখণ্ড ছিলেন না, পিতাও না, পুত্রেরাও না বা বংশের অপর কোনও নারী বা পুরুষ না। নিজের ঘরের কোণে এইরূপ জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত দেখিবার পরেও কি তোমাদের চক্ষু খুলিবে না? চিরকাল কি তোমরা অন্ধ হইয়া থাকিবে?

যাহাদের পৌরহিত্য ব্যবসায় আছে, তাহারা দীক্ষার দিক দিয়া অখণ্ড বলিয়া পরিচয় দিলেও রুটি মারা যাইবার ভয়ে অখণ্ড-মতে শ্রাদ্ধের বিরোধিতা বা সুকৌশলে তাহাকে পণ্ড করিবার চেষ্টা করিতে

পারে। কেননা, কৌলিক শ্রাদ্ধের যত আয়োজন, তাহার অধিকাংশই ত' পুরোহিতের ঘরে চলিয়া যায়, একটা শ্রাদ্ধ হওয়ার মানে এই যে, মৃতব্যক্তির পুরোহিতের ঘরে বহুবিধ নানা সম্ভার পৌছাইয়া দিতে হইবে। জোর করিয়া কাড়িয়া নিলে দৃষ্টিকটু দেখায়, এইজন্যই কতকগুলি মন্ত্রতন্ত্রের সমাবেশ করিয়া পুরোহিতের এই দস্যুতাকে ঢাকা হইয়াছে,—কেহ এইরূপ অভিযোগ করিলে তাহা নিতান্ত মিথ্যা হইয়া যাইবে না। পুরোহিতের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হইয়াই যে কেহ কেহ অখণ্ডমতীয় শ্রাদ্ধে আগ্রহী হন, এইরূপ বলিলে তাহাও হয়ত ভুল হইবে না। পুরোহিতের লোভ যেখানে একটা অনুষ্ঠানকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছে, সেখানে পৌরহিত্যতন্ত্রীদের আত্মসংশোধনের চেষ্টা যে প্রয়োজন, একথা কেন তোমরা ভাবিবে না?

আমি কখনো এই নির্দ্দেশ দেই নাই যে, শ্রাদ্ধ বা বিবাহ অখণ্ড-মতেই করিতে হইবে। যাহার ইচ্ছা হয় সে কৌলিক মতেই করুক। আমি যাহা উচ্চারণ করিয়াছি, তাহা এই যে, একদা অসংখ্য বিবাহ এবং শ্রাদ্ধ অখণ্ড-মতে হইবে, যাহাতে পৌত্তলিকতার স্থান নাই, যাহাতে বহু দেবতার নামে মন্ত্রোচ্চারণ নাই, যাহাতে ব্যয়বহুল নানা আচার, উপচার এবং উপায়নের প্রয়োজন নাই, যাহাতে শ্রাদ্ধকারী বা বিবাহকারীর পক্ষে দুর্ব্বোধ্য বা অবোধ্য কোনও কিছুর অস্তিত্ব নাই, যাহাতে অন্তরভরা ভক্তি ও শ্রদ্ধা এবং সরল বিশ্বাসে কার্য্য সম্পাদন হয়। ইহাতে পুরোহিতের দাপট নাই। শাস্ত্রাজীবের কাপট্য নাই, স্মার্ত্ত পণ্ডিতের হুঙ্কার নাই, আছে সরল বিশ্বাস এবং সহজ অনুষ্ঠান। ইহা যুগোপযোগী এবং প্রাগৈতিহাসিক

যুগ হইতে অদ্য পর্য্যন্ত যে-সকল আচার অব্যাখ্যাত বিধায় কুসংস্কারের পর্য্যায়ে পড়িয়াছে, তাহা হইতে মুক্ত।

শ্রীমান হ্-র পিতৃশ্রাদ্ধ অখণ্ড-মতে হইবে, এই প্রস্তাব লইয়া যখন সে গলবস্ত্র হইয়া শীর্ণ দেহে, দীনবেশে তোমাদের দুয়ারে দুয়ারে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছিল, তখন তোমরা তাহাকে সহায়তার প্রতিশ্রুতি না দিয়া ভয়-প্রদর্শনকারীদের নিকটে নতিস্বীকার করিতে প্ররোচনা দিয়াছিলে কি জন্য, তাহা বলিতে পার? তোমরা নিজেদিগকে অখণ্ডদের নেতৃস্থানীয় বলিয়া মনে কর। কিন্তু স্বাভাবিক গতিতে অখণ্ড-বাদ যখন নিজের পরিণত মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিতে যায়, তখন যাহা স্বাভাবিক, তাহা হইতে না দিয়া কেহ কেহ ভিন্নমুখী দুই আদর্শের জগাখিচুড়ী পাকাইতে কেন উপদেশ দিতে যাও? এইগুলি তোমাদের পরিত্যাগ করা প্রয়োজন, নতুবা নেতৃত্ব থাকিবে না। অনেক কালের অভ্যাস-বশে মুখে আরও কিছুকাল তোমাদিগকে নেতা বলিয়া স্বীকার করিলেও মনে মনে ইহারা তোমাদিগকে অশ্রদ্ধা করিবে এবং সভাস্থলে উচ্চ আসনে বসিবার অধিকার আরও কিছুকাল তোমরা পাইয়া গেলেও অন্তরের অন্তরে ইহারা তোমাদিগকে খল, প্রবঞ্চক, অপাংক্তেয় এবং হেয় বলিয়া জ্ঞান করিবে। ইহাতে তোমাদের কি লাভ হইবে? যাহাদের নিজেদের সৎসাহস নাই, তাহারাও অপরকে সৎসাহসের পথে চলিতে দেখিলে উৎসাহ দেয়, ইহাই মনুষ্যরীতি। তোমরা সেই রীতির বাহিরে কেন যাইতেছ?

উক্ত প্রশ্নের জবাব হয়ত এই যে, তোমরা সাধন কর না। অথবা

উহার জবাব হয়ত এই যে, তোমাদের গুরুভক্তি নাই। অথবা প্রকৃত জবাব হয়ত এই যে, মনুষ্যত্বের বিকাশের দিক দিয়া তোমরা অঙ্গহীন, পঙ্গু, নেত্রশ্রোত্রাদি-বর্জ্জিত জড়পিণ্ড মাত্র। প্রকৃত জবাব খুঁজিয়া বাহির কর। তারপরে আত্ম-সংশোধন কর। নতুবা জীবন এক মহাবিড়ম্বনা স্বরূপ হইবে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(২৮)

হরি-ওঁ মঙ্গলকুটীর
রবিবার, ২২শে ফাল্গুন, ১৩৭২

কল্যাণীয়েষু

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশীস জানিও।

অনেকদিন যাবৎ তোমাদের খবর পাই না। কিন্তু সম্প্রতি উমেদনগরে একটী ভক্তিমান অখণ্ডের পিতৃশ্রাদ্ধের ব্যাপারে তোমরা এবং নিকটবর্ত্তী কয়েকটী সম্মানিত অখণ্ডমণ্ডলীর অখণ্ডেরা চতুর্দ্দিকের সকল অখণ্ডগণের নিকট একটা খবর হইয়া দাঁড়াইয়াছ। তোমরা কেহই জান না কিন্তু আমি জানি যে, তোমাদের অনেকের আচরণ চতুর্দ্দিকের সমগ্র অখণ্ড সমাজকে বিক্ষুব্ধ করিয়াছে। তোমরা অনেক আগে দীক্ষিত বলিয়া এবং কেহ কেহ ভাল বক্তৃতা দিতে জান বলিয়া নূতন অখণ্ডেরা তোমাদিগকে নেতার সম্মান দিয়া থাকে। কিন্তু তোমরা উমেদনগরের ব্যাপারে নিদারুণ ভুল করিয়াছ। এইরূপ ভুল তোমাদের না হওয়াই উচিত ছিল। তোমাদের মনে রাখা সঙ্গত যে, তরুণ-সমাজ বিচার-বুদ্ধি দিয়া নেতা-নামধারীদিগকে ওজন করিয়া দেখিতে

কুণ্ঠিত নহে। অখণ্ড-মতে শ্রাদ্ধ বাধ্যকর নয় কিন্তু কেহ যদি তাহা করিতে আগ্রহী হয়, অপর অখণ্ড কেন তাহাতে নৈতিক সমর্থন জানাইবে না, তাহা আমি বুঝিতে পারি না। সম্ভবতঃ তোমরা নামেই অখণ্ড এবং সাধন কর না। সম্ভবতঃ তোমরা বক্তৃতা দিবার বেলায়ই অখণ্ড-মতের উদ্‌গার করিয়া থাক কিন্তু ইহার এক কণাও তোমাদের উপলব্ধিতে আসে নাই। ইহারই জন্য তোমরা একজন তরুণ গুরুভ্রাতার পিতৃশ্রাদ্ধ অখণ্ড-মতে হইবে শুনিয়া উল্লসিত হইতে পার নাই। কিন্তু সামাজিক উৎপীড়নের ভয়ে, দাঙ্গা বাধাইবার ভীতি-প্রদর্শনের ফলে একান্তই নাচার হইয়া যেই ব্যক্তি কৌলিক-মতে শ্রাদ্ধ করিতে বসিল, পুরোহিত যখন মন্ত্র আওড়াইয়া যাইতেছিলেন, তখন যে তাহার ঠোঁট নড়ে নাই, তখন যে সে চক্ষু বুজিয়া রহিয়াছিল, ইহার কিছু অর্থ তোমরা বুঝিয়াছ? তোমাদের কাছ হইতে সহায়তার প্রতিশ্রুতির পরিবর্ত্তে বিভীষিকা দর্শন করিয়া সে শ্রাদ্ধের ভান করিয়াছে। তোমাদের কুলপ্রথার সম্মান ইহাতে রহিল ত'?

তোমরা এই জাতীয় ভুল আর করিও না। সে শ্রাদ্ধকালে যাহা কিছু করিয়াছে, মনে মনে ভাবিয়াছে, দুর্ব্বৃত্তদের চাপে পড়িয়া করিলাম। তোমাদিগকে সে নেতা বলিয়া মান্য করিত। আর কি তাহার নিকট হইতে পূর্ব্বকীয় শ্রদ্ধা পাইবে? একটা দামী জিনিষ হারাইয়াছ বাবা, যাহা পয়সায় কেনা যায় না।

অতঃপর তোমাদের আত্মসমীক্ষণ এবং আত্মপরীক্ষণ প্রয়োজন। তোমাদের প্রয়োজন আত্মসংশোধন। মানুষের শ্রদ্ধা তোমাদের উপর হইতে সরিয়া যাইতেছে, ইহাই তোমাদের পক্ষে বড় সমস্যা নহে, তোমাদের নিজেদের পরিবারস্থ লোকদের নিকটেও যে তোমরা হেয়

হইয়া পড়িতেছ, ইহাও নহে, নিজেদের কাছেই যে তোমরা আস্তে আস্তে ছোট হইয়া যাইতেছ, তাহার প্রতীকার প্রয়োজন। মানুষ নিজের কাছে নিজে যখন হেয় হয়, তখনই সে দলাদলি-প্রিয় হয়, তখনই সে আধ্যাত্মিক আনন্দের ব্যাপারকে ব্যক্তিগত স্বার্থ-সাধনের মানদণ্ডে ওজন করিতে চাহে। এই অধঃপতন হইতে পরমেশ্বর তোমাদিগকে রক্ষা করুন। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(২৯)

হরি-ওঁ

মঙ্গলকুটীর

সোমবার, ২৩শে ফাল্গুন, ১৩৭২

৭/৩/৬৬

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

এই মাত্র আর একজনের একখানা পত্র পাঠ করিলাম, যাহার বক্তব্য ঠিক তোমার পত্রের অনুরূপ। সেও তোমারই মত লিখিয়াছে, পার্থিব জগতের কোনও অভাব-অভিযোগ তাহাকে উৎপীড়ন করে না। চাকুরী-বাকুরী করিতেছে, ভাইবোনদের সঙ্গে মিলিয়া একত্র সংসারে বাস করিতেছে, কোথাও কোনও অশান্তি নাই, তথাপি জীবনটী ার্থহীন বলিয়া মনে হইতেছে।

তোমার মত তাহাকেও লিখিলাম,—তোমার ভিতরে আকৈশোর যে উন্নত প্রেরণা রহিয়াছে, তাহা করণিকের কাজেই নিঃশেষ হইয়া

যাইবে, ইহা মনে করিও না। যাহা কিছু কর, জগদ্বাসীর কল্যাণের জন্য করিতেছ, এই ভাব নিয়া কাজ করিতে থাক, দেখিবে আস্তে আস্তে আনন্দ আসিবে"। তাহাকে যাহা লিখিলাম, তোমাকেও তাহাই লিখিতেছি—"হতাশ হইও না। তোমার জীবন একা তোমার জন্য নহে, জগদ্বাসী সকলের জন্য। সই ভাবটা অন্তরে নিয়ত পোষণ ও পরিবর্দ্ধন করিতে থাক। দেখিতে না দেখিতে জীবনের জীবনের রথচক্র বিজয়-নির্ঘোষ অগ্রসর হইবে"।

পরমেশ্বরে আত্মসমর্পণ কর, তাহাতেই জীবন আনন্দময় হইবে,—একথাও বলিতে পারিতাম। কিন্তু তাঁহাকে নিয়া কলহ আছে। কেহ বলিবে, তিনি নাই, কেননা তাঁহাকে চোখে দেখিতে পাই না। যাহা প্রত্যক্ষ নহে, তাহা অগ্রাহ্য। কিন্তু জগৎটাকে নিয়া, জগদ্বাসীকে নিয়া সেই কলহের সম্ভাবনা নাই। জগৎ যে আছে, কোটি কোটি জগদ্বাসী যে আছেন, তাহা প্রত্যেকে দেখিতেছে, বুঝিতেছে। ইহাদের সকলের কুশলকে নিজের জীবনের সহিত অভেদ-সম্পর্কে আনিতে পারিলে শান্তি অনিবার্য্য, আনন্দ অবধারিত। যে ঈশ্বর মানো না, সেও জগৎকে, জগদ্‌বাসীকে মানিতে পার। তোমার চাই শান্তি, তার পথ আমি বলিয়া দিলাম। তোমার চাই আনন্দ, তার উপায় আমি দেখাইয়া দিলাম। এখন বাকী কাজটুকু তোমাকে করিতে হইবে। শান্তি ও আনন্দ প্রেম হইতে আসে। জগদ্বাসীকে প্রেম দাও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৩০)

হরি-ওঁ

কলিকাতা

৯ই চৈত্র, বুধবার, ১৩৭২ বাং

কল্যাণীয়েষুঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

ত্রিপুরার ঐ দুর্গম পার্ব্বত্য সহরটীতে পনর খানা "প্রতিধ্বনি" যায় শুনিয়া সুখী হইয়াছি। তবে, যেখানে পনর খানা যাওয়া সম্ভব, সেখানে পঞ্চাশ খানা যাওয়াও অসম্ভব নহে। কিছুই যে অসম্ভব নহে, এই কথাটী বিশ্বাস করিয়া তোমরা কাজ করিও। তোমরা সর্ব্বক্ষণ মনে রাখিও যে, উদ্দেশ্য সৎ এবং চেষ্টা নিষ্কাম হইলে ভগবান সকল দিক দিয়া সহায়তা করেন। আমি জানি যে, চতুর্দ্দিকে অসত্যের প্রতিষ্ঠা, দলবাজির ষড়যন্ত্র এবং গলাবাজির চঞ্চলতা অধিকাংশ লোকের মন বিভ্রান্ত করিয়া ফেলিতেছে। কিন্তু তথাপি তোমরা এই বিশ্বাস হারাইও না যে, ঈশ্বর-বিশ্বাস, চরিত্রবল এবং নিষ্কাম কর্ম্মৈষণার জয় হইবেই হইবে। মানুষের মনে সদ্ভাব সঞ্চারণের জন্য পুস্তক-পুস্তিকা, পত্র-পত্রিকা প্রভৃতির প্রয়োজন চিরকালই থাকিবে। নিজেদের দল বাড়াইবার জন্য নহে, অপরের দলকে পরিক্ষীণ করিবার জন্যও নহে, সত্যকে দলনিরপেক্ষ ভাবে প্রত্যেকটী মানুষের অন্তরের অন্তরে গাঁথিয়া দেওয়ার মধ্যেই ইহাদের সার্থকতা এবং উহাই ইহাদের প্রকৃষ্ট উপযোগিতা।

হতাশকে আশা দাও, দুর্ব্বলকে বল দাও, অক্ষমকে শক্তি দাও, ভগ্নোৎসাহের প্রাণে উৎসাহ জোগাও—দল বাড়াইবার জন্য নহে, মানুষের নিকট মনুষ্য-জন্মের সম্মান বাড়াইবার জন্য। মানুষরা অমানুষ

রহিয়া গেল এবং তোমার দল বাড়িল, তাহাতে জগতের কি লাভ হইল?

সম্প্রতি নিখিল-ভারত অখণ্ড-মহাসম্মেলনের বিষয়-নির্ব্বাচনী সমিতির অধিবেশনে বারাণসীতে তোমরা স্থির করিয়াছ যে, তোমরা সমসাধকদের সংখ্যা বাড়াইয়া চলিবে। হোজাইতে মহাসম্মেলনেও নিশ্চিত তাহাই তোমাদের সিদ্ধান্ত হইবে। এতকাল সংখ্যাবৃদ্ধির এই চেষ্টাটাকে আমি নিষিদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলাম। তাহার উদ্দেশ্য এই ছিল যে, ব্যক্তিগত ভাবে সাধন করিয়া তোমরা প্রত্যেকে উদ্দীপ্তবুদ্ধি, বিকশিত-ধী এবং উৎফুল্লপ্রাণ হইয়া উঠ। তখন তোমরা পরশমণি হইবে। তখন তোমাদের সংস্পর্শে আসিয়া সহস্র সহস্র লৌহখণ্ড অনায়াসে সুবর্ণে পরিণত হইবে। এইরূপ যে কোথাও কোথাও হয়নাই, তাহা নহে। কিন্তু প্রচারক-জীবনের অর্দ্ধশতাব্দী পার করিবার অনেক পরে আজ দেখিতেছি, তোমাদের প্রতি প্রদত্ত প্রচারবিমুখ এই নিষেধাজ্ঞা তোমাদের প্রতিবেশকে প্রতিকূল হইবার যথেষ্ঠ সুযোগ দিয়াছে এবং স্বাভাবিক ভাবে বাড়িয়া যাইবার সঙ্গত পথে নানা দুর্যোগ সৃষ্টি করিয়াছে। ইহারই ফলে অর্থাৎ পরিস্থিতির পরিবর্ত্তন-হেতু তোমাদের প্রতি প্রদত্ত নির্দ্দেশেরও পরিবর্ত্তন ঘটিল। নব-নির্দ্দেশকে তোমরা দেশ-সেবা, সমাজ-সেবা ও জগৎ-সেবার অনুকূলে কিভাবে ব্যবহার কর, তাহা লক্ষ্য করিবার পরে পুনরায় অন্যরূপ নির্দ্দেশ দান অসম্ভব নহে।

আমি চাহি, তোমরা তরবারির মতন ধারাল হও কিন্তু শর্করার মতন মিষ্টি হও। আমি চাহি, তোমরা বিশ্বামিত্রের মতন সাধক হও, তপস্বী হও কিন্তু বশিষ্টের মতন হও ধীর, স্থির, ব্রহ্মজ্ঞ ও ক্ষমাশীল।

আমি চাহি, তোমরা অগস্ত্যের মত দিগ্দেশ ব্যাপিয়া বিচরণশীল হও, শঙ্করাচার্য্যের মতন দিগ্বিজয়ী হও কিন্তু নারদের মতন হও ভক্ত ও হরি-গুণগানপরায়ণ। আমি চাহি যুগপৎ তোমরা কর্ম্মী হও, জ্ঞানী হও, ভক্ত হও, নিজেরা নিজ নিজ সাধনে একান্তভাবে অভিনিবিষ্ট হও কিন্তু জগৎ-কল্যাণের মুখ চাহিয়া, প্রাণে প্রাণে সত্য প্রতিষ্ঠার তাগিদে প্রচার-কার্য্যকেও প্রত্যেকে ব্রতস্বরূপে গ্রহণ কর। ধর্ম্ম প্রচার, আদর্শ প্রচার প্রভৃতিকে আত্মপ্রচার বা স্বার্থপ্রতিষ্ঠার উপায় রূপে কেহ কদাচ গ্রহণ করিও না। জগৎকে শুধু দাও, দিয়া কৃতকৃতার্থ হও। দিয়া যে সুখ, নিয়া সেই সুখ নাই।

আমার বক্তব্য তোমাদের নিকট সুস্পষ্ট হইয়াছে কি না, ইহা আমাকে জানিতে দিও। আমি জানিতে চাহি তোমাদের মুখের ভাষায় নহে,—তোমাদের কর্ম্ম, কর্ম্ম-প্রণালী ও কর্ম্মলব্ধ ফল হইতে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৩১)

হরি-ওঁ

কলিকাতা

৯ই চৈত্র, ১৩৭২, বাংলা

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

শ্রীমান দে-র পত্রে তোমার বিষয় বিস্তারিত জানিয়াছি। তোমার ত্যাগ কর্ম্মঠতা এবং নেতৃত্ব বহুজনের ভিতরে নবভাবোন্মেষ ঘটাইতেছে জানিয়া বড়ই সুখী হইলাম। তুমি যাহা করিতেছ বা করিতে পারিতেছ,

তাহা যে অপর সকলের পক্ষে সম্ভব এবং সঙ্গত, এই আস্থাটী তোমার প্রতিটী সমসাধকের মনে জাগাইয়া দাও। নিতান্ত স্বার্থসেবীও ফাঁকে ফাঁকে যে যথেষ্ট পরিমাণ পরার্থ-সেবা করিতে পারে, জগতে ইহার দৃষ্টান্ত আছে। সংসার লইয়া যাহারা একান্ত ব্যস্ত, তাহারা উহার মধ্যেই একটু ফাঁক করিয়া লইয়া জগতের বৃহত্তর কল্যাণের জন্য কিছুকাল খাটিতে পারে। সকলকে এই ভাবে মহৎ কল্যাণের সহিত আংশিক রূপে এবং সাময়িক ভাবে সংযুক্ত রাখিবার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া কাজ কর বাবা, কয়েক বৎসর পরে সেই ক্ষুদ্র সেবাগুলির সম্মিলিত শুভফল এক সঙ্গে পাইবে। ইহা কোনও আনুমানিক কল্পনা নহে, ইহা প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা।

অনেক দূরবর্ত্তী স্থানের লোকেরা একত্র এক জায়গায় মিলিয়া মণ্ডলী করিলে দূরবর্ত্তী স্থানের লোকদের উপাসনায় যোগ দিতে অসুবিধা হয়। সুতরাং যে-কোনও একটা গ্রামে পাঁচ সাত জন সম-সাধক থাকিলে সেখানে একটী মণ্ডলী স্থাপন অবশ্যই কর্ত্তব্য। আমি ত' বলি, দুই তিন জন লোক যদি একত্র মিলিত হইতে পারে, তাহা হইলেই সমবেত উপাসনা চলিতে পারে। উপাসকগণের পুরোভাগে আমার জন্য ত' একটী আসন থাকিবেই। সুতরাং আমার আসনের পশ্চাতে বসিবার জন্য যদি মাত্র দুইজনও উপাসক পাওয়া যায়, তাহা হইলেই ত' একটী মণ্ডলী স্থাপন সম্ভব হইতে পারে। যে মণ্ডলী আজ ছোট আছে, কিছুদিন পরে তাহা বড় হইবে, এই বিশ্বাসটী তোমরা রাখিও।

আমি আসিলে তোমাদের ঐ পার্ব্বত্য সহরে এক হাজার লোক দীক্ষা নিবেন বলিয়া তোমাদের পত্রে জানিলাম। এই সংবাদ সত্য হইলে নিশ্চয়ই সুখের। কিন্তু দীক্ষা নেওয়াটাই বড় কথা নহে, দীক্ষা নিলে সাধনও করিতে হয়। লোকে সাধন করিবে, এ কথা শুনিলে আমি আনন্দিত হই,—দীক্ষা নিবে, একথা শুনিলে নহে। দীক্ষাটা যেখানে লোকাচার বা প্রথা, সেখানে সাধন করিবার আগ্রহ কয়জনের থাকে? কিন্তু লোকে সাধন যদি করে, তাহা হইলে তাহার শুভ ফল সমস্ত জগতে পরিব্যাপ্ত হয়। তোমরা সাধক সৃষ্টির চেষ্টা কর, শিষ্য সৃষ্টির কথা ভাবিও না। দল-মত-পথ-নিরপেক্ষ সাধন-রুচি বিশ্বের যাবতীয় অকল্যাণ নাশ করিবে এবং মানুষের সহিত মানুষের সম্পর্ককে সরল এবং রসাল করিবে। একটা ক্ষুদ্র পার্ব্বত্য-অঞ্চলে এক হাজার নরনারী দীক্ষার জন্য ব্যাকুল হইয়া আছেন, একথা শুনিতে আনন্দ লাগে। তোমরা যে তোমাদের নিজ নিজ সাধন-পরায়ণতা দ্বারা মানুষের মনে শ্রদ্ধার উদ্রেক করিয়াছ, ইহা বোঝা যায়। কিন্তু তাহাই যথেষ্ট নহে। দীক্ষা যাহারা পাইল বা পাইবে, তাহারা আমৃত্যু সাধন করিবে,— নিজেদের সাধনের সুফল জগদ্বাসীকে অকৃপণ হস্তে বিলাইতে থাকিবে,—সাধন করিবে নিখিল বিশ্বের কুশলের দিকে তাকাইয়া,— সাধন করিবে দেহমনঃপ্রাণ হইতে ভেদবুদ্ধি, হিংসাপরায়ণতা এবং পরশ্রীকাতরতা পরিত্যাগ করিয়া,—ইহাই চাহি। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৩২)

কলিকাতা

হরি-ওঁ

৯ই চৈত্র, ১৩৭২

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিষ জানিও।

তোমাদের ঐ ক্ষুদ্র পার্ব্বত্য-অঞ্চলের বাজারটীতে বোধ হয় আট বৎসর পূর্ব্বে গিয়াছিলাম। ছিলাম একটী মাত্র দিন। তোমরা তখন যে যাহা করিয়াছিলে, তাহা এখনও আমার মনে জাগরূক রহিয়াছে। কিন্তু তোমরা যে ওখানে আমার স্মৃতিকে ধরিয়া রাখিবার জন্য বৎসরে একবার করিয়াও একটী প্রীতিপূর্ণ অনুষ্ঠান কর, ইহা জানিয়া বিস্ময়-বোধ করিতেছি। আমি তোমাদিগকে মুখের বাক্য এবং অন্তরের আশীর্ব্বাদ ছাড়া আর কিছুই দিতে পারি নাই। সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতার ঊর্দ্ধে উঠিয়া তোমাদিগকে ঈশ্বরারাধনা করিতে বলিয়াছিলাম। তোমরা সেই নির্দ্দেশ আংশিক ভাবে হইলেও যে পালন করিতেছ, ইহা আমাকে তৃপ্তি দিয়াছে। তোমরা যে-কয়জন সমসাধক ওখানে আছ, তাহারা সকলে মিলিয়া এমন ভাবে সংগঠন চালাও, সেই সংগঠন এমন হউক ব্যাপক এবং এমন হউক গভীর, যাহাতে ছোট, বড়, নিকটের এবং দূরের সকল মানুষ অখণ্ড-আদর্শের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ও আকৃষ্ট হয়। তোমরা নিজেদের মধ্যে প্রেম, প্রীতি ও ঐক্যের অনুশীলন উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত করিয়া যাও। ঈশ্বরের প্রতি অনুরাগ তোমাদের দিনের পর দিন প্রগাঢ়তর হইতে থাকুক। তোমাদের ঈশ্বরানুরাগ প্রতিটী মানুষের প্রাণকে ভগবৎ-প্রেমে উদ্দীপিত, উদ্ভাসিত ও উচ্ছলিত করুক।

চতুর্দ্দিকে মানুষের প্রাণ ভগবৎ প্রেম-পিপাসায় কাতর অথচ তাহারা তাহা জানে না। নানারূপ প্রতিকূল পরিস্থিতি তাহাদের মনকে বিভ্রান্ত এবং সঙ্কল্পকে বিধ্বস্ত করিয়া দিতেছে। তাহাদিগকে মরুতৃষ্ণিকার উৎপীড়ন হইতে রক্ষা করিবার জন্য তাহাদিগের প্রাণের সহিত তোমাদের প্রাণ যুক্ত কর। তাহাদিগকে খুঁজিয়া বাহির করিয়া প্রত্যেককে তোমাদের আত্মার আত্মীয় কর। যাহারা নাস্তিক, তাহাদিগকে ঘৃণা না করিয়া ঈশ্বরের নামে অন্তরের অন্তরতম সম্বন্ধে আবদ্ধ কর এবং তাহাদের ভাবী জীবনের গতিপথের উত্তরদিকে সগৌরবে তোমাদের পূর্ণাঙ্গ আদর্শের পতাকাকে উচ্চে তুলিয়া ধর।

আমাদের যে কেহ পর নাই, একথা মনে রাখিতে হইবে। পর বলিয়া ভাবিতে ভাবিতে আপন জনও পর হইয়া যায়। আপন ভাবিতে ভাবিতে পরকেও আপন করা যায়। অবশ্য, ব্যাঘ্র বা সর্পকে আপন করা কঠিন। কেন না, হিংসা ইহাদের মজ্জাগত স্বভাব। ভগবান যাহাদিগকে স্বভাব-ধর্ম্ম রূপে হিংসা দিয়াছেন অথবা হিংসার চর্চ্চাকে যাহারা পুরুষানুক্রমে পৌরুষ এবং প্রতিভা বলিয়া ভাবিয়া আসিয়াছে বা আচরণের দ্বারা প্রতিপন্ন করিতে চাহিয়াছে, চাহিতেছে এবং খুব সম্ভবতঃ চাহিবে, বাহাদুরী করিবার জন্য তাহাদিগকে আপন বলিয়া না জানিয়াও আপন বলিয়া ঘোষণা করার মতন মূর্খতা কিছু নাই। বড় বড় কথা বলিবার মুক্তজনোচিত প্রলোভন অনেক বুদ্ধিমান ব্যক্তিকেও বিভ্রান্ত করিয়া থাকে। এই বিভ্রান্তি জগদ্বাসীকে আপন করিবার সহায়িকা নহে। বিশ্বের সকলকে আপন করিবার জন্য যাহা চাই, তাহার নাম অপার অকৃত্রিম অনাবিল আন্তরিক প্রেম। আন্তরিক প্রেমভাব লইয়া কেহ যদি দুষ্টের দমনের জন্য অস্ত্র ধারণও করে, তবে তাহাকে হিংসার অপবাদ দেওয়া চলে না।

বিষাক্ত বাষ্পে আচ্ছন্ন বায়ুমণ্ডল পরিক্রমণ করিতে নিরাপত্তা-সাধক মুখস চাহি। এই মুখসেরই অপর নাম সতর্কতা। সতর্কতা আর অনাত্মীয়তা এক কথা নহে। যাহাকে আত্মীয় বলিয়া জানিতেছি, স্থান-বিশেষে, কাল-বিশেষে, পাত্র-বিশেষে তাহার সম্পর্কেও সতর্কতার আবশ্যকতা পড়ে। পুত্র অপেক্ষা নিকটতর আত্মীয় পিতার কেহ নাই। কিন্তু ধনবান্ বৃদ্ধ পিতা চরিত্রহীন যুবক পুত্র সম্পর্কে সতর্কতা অবলম্বন আবশ্যক মনে করেন। এস্থলে সতর্কতা আত্মীয়তার অস্বীকৃতি নহে। অনাত্মীয়কে আত্মীয় করিতে হইবে, এই কথার অর্থ ইহা নহে যে, যাহাকে আত্মীয় করিবার জন্য আমার বা তোমার অধ্যবসায়, তাহার শরীরে যদি সংক্রামক ব্যাধি থাকে, তাহার মনে যদি হিংসার কালকূট থাকে, তাহার ঐতিহ্যে যদি শত্রুতা এবং সম্ভাবনায় যদি বিরুদ্ধতা থাকে, তথাপি সতর্ক হইব না। বাঁচিয়া থাকিতে হইলেই সতর্কতার প্রয়োজন। কিন্তু অনন্তকাল বাঁচিতে হইলে জগতের প্রত্যেকের সহিত আত্মীয়তার প্রয়োজন। যেই সতর্কতার দ্বারা সাময়িক ভাবে বাঁচিয়া থাকিবার সহায়তা হয়, সেই সতর্কতার অভাব বশতঃ যদি অকালে নিশ্চিহ্ন হইতে হয়, তাহা হইলে অনন্ত জীবনের সুখাস্বাদন কে করিবে? এইখানেই দার্শনিক উচ্চচিন্তার সহিত বাস্তব জীবনের অস্তিত্ব রক্ষার প্রশ্নটী একটী সুস্পষ্ট সংঘর্ষে আসিয়া দাঁড়ায়। এই সংঘর্ষকে গরলরিক্ত করিবার একমাত্র উপায় প্রেম।

আমি তোমাদিগকে যেখানে যখন যে উপদেশটী দিয়া যাইতেছি, তাহাতে আমি সকল দিকের সামঞ্জস্য রক্ষার চেষ্টা করিতেছি। জানি না, আমার এই সামঞ্জস্যমূলক ধর্ম্মদেশনার তাৎপর্য্য তোমরা বুঝিতে পার কি না। খণ্ড ভাবে আমি সংসারের একটী সমস্যাকেও কদাচ

বিচার করি না। সামগ্রিক দৃষ্টি নিয়া প্রত্যেকটী সূচনা এবং পরিণতিকে লক্ষ্য করিয়া যাইতেছি বলিয়াই কটু কর্ত্তব্য সমূহ সম্পর্কে সর্ব্বদা নির্ভয়ে এবং নির্ব্বিদ্বেষ চিত্তে বাক্যোচ্চারণ করিয়া যাইতে পারিতেছি। আমাকে যদি শ্রদ্ধা কর, তবে সাধননিষ্ঠ হও। আমাকে যদি ভালবাস, আমাকে যদি ভক্তি কর, তাহা হইলে নিবিড় সাধনে আত্মনিয়োগ কর। আমার নাম করিয়া জয়ধ্বনি করিলেই আমি খুশী হইয়া যাইব না। সাধন করিয়া সত্যকে উপলব্ধিতে আন এবং উপলব্ধ সত্যকে জীবনের অনুশীলনে রূপবন্ত কর। বিশ্বকে আপন করিব, এই সংকল্প অর্থহীন নহে এবং একমাত্র হৃদয়াবেগের দ্বারা পরিচালিত হইলেই এই সংকল্পের সংসিদ্ধি ঘটিবে না। সাধনোত্থ অমৃত হইতেই তাহার যোগ্যতা অর্জ্জন করিবে। নিজের সাধনকে পরিপুষ্ট ও পূর্ণাঙ্গ করিয়া লইবার জন্য যে একনিষ্ঠ প্রযত্ন আবশ্যক, তাহা যেন তোমাকে কদাচ পরিত্যাগ না করে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৩৩)

হরি ওঁ

বারাণসী

রবিবার, ১৩ই চৈত্র, ১৩৭২

২৭-৩-৬৬

কল্যাণীয়েষু,

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

নিজে যদি স্পষ্ট অনুভব করিয়া থাক যে, তুমি যেই পথে

চলিয়াছ, সেই পথ সত্য পথ, তাহাতে ঝুটা চীজ কিছুই নাই, তাহাতে মেকীবাজী নাই, ছল-প্রবঞ্চনা নাই, তাহা হইলে সেই পথে জনসাধারণকে ডাকিয়া আনিবার বৈধ অধিকার তোমার নিশ্চিতই রহিয়াছে। তুমি যদি বুঝিয়া থাক যে, এই পথে চলিয়া তুমি শান্তি, স্বস্তি ও আত্মশ্রদ্ধা ফিরিয়া পাইয়াছ, তাহা হইলে অপর দশজনকে ডাকিয়া আনিয়া এই পথের পথিক হইতে আগ্রহবান্ করিবার চেষ্টা তোমার পক্ষে দোষাবহ নহে। কিন্তু যদি কখনও দেখ যে, বাহিরের লোককে তোমার মতে এবং পথে আকৃষ্ট করিবার চেষ্টা না থাকায় তোমার গতিপথে নূতন নূতন কণ্টকের সৃষ্টি হইয়াছে, তোমার মজ্জাগত দুর্ব্বলতা বিষাক্ত কীটের মত নানা উপদ্রব সৃষ্টি করিয়া তোমাকে দুর্ব্বল হইতে দুর্ব্বলতর করিতেছে, তাহা হইলে নিজমত ও নিজপথকে সর্ব্বজনের দ্বারা গৃহীত করাইবার জন্য তোমার পক্ষে সর্ব্বপ্রকার সততামূলক চেষ্টা কেবল বৈধই নহে,—একান্ত প্রয়োজনীয়ও। আমি তোমাদের বর্ত্তমান অবস্থা তাহাই দেখিতেছি এবং পরিস্থিতির সহিত তাল রাখিয়া চলিবার জন্য নূতন নির্দ্দেশ দিয়াছি। এই নির্দ্দেশ তোমাদেরই কুশলের জন্য। সুতরাং তোমরা এতকাল যদি জড়-ভরতকে আদর্শ করিয়া থাক, তবে এখন চিরকর্ম্মকুশল বিশ্বকর্ম্মার পদাঙ্ক অনুসরণে প্রস্তুত হও।

তোমাদের কোনও কোনও মণ্ডলীতে যখন ঝগড়া বাঁধে, তখন আমি সকলের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝি দূর করিবার চেষ্টায় নামিলে অমনি শ্লোগান সুরু হইয়া যায়,—নাঃ, আমাদের মধ্যে কোনও কলহ নাই। আবার যখন তোমরা সকল কলহ মিটাইয়া ফেলিয়া এক হইয়া গিয়াছ বলিয়া শুনিতে পাই, তখন দেখা যায় যে, একদল সকল

কাজকর্ম্ম ছাড়িয়া দিয়া সাংখ্যের পুরুষ হইয়াছে এবং মিটমাটের সর্ত্ত যেই দলের লোকের একটু অনুকূল হইল, সকল কাজ সমাপন করিবার গুরুদায়িত্ব একমাত্র তাহাদেরই স্কন্ধে আসিয়া ভার করিয়াছে। দুইটী অবস্থাই কপটতার ফল। সরলতার অনুশীলন থাকিলে কি আগেরটী কি পরেরটী কোনও অবস্থারই সৃষ্টি হইতে পারিত না। কপটতা যখন প্রভুত্বপ্রিয়তার সহিত যুক্ত হয়, তখন অকারণে কর্ম্মঠ লোকগুলি হঠাৎ অলসের বাদশা হইয়া যায় এবং তাহাদের মুরব্বী-আনার দামী দামী কথা ছাড়া আর কিছুরই জৌলস থাকে না। এইরূপ হেয় ও নিন্দনীয় পরিণতি হইতে তোমরা আত্মরক্ষা করিয়া চলিও।

একদলের উপরে দায়িত্ব পড়িবে এবং অন্যদল তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিয়া নিজেদের দাম বাড়াইবার ব্যর্থ চেষ্টা করিবে, আদর্শ-প্রতিষ্ঠানের অন্তর্ভুক্ত কর্ম্মী ও নেতাদের আচরণ ইহা নহে। প্রধান সেনাপতি হইতে সুরু করিয়া সামান্য পদাতিকের পর্য্যন্ত যখন দায়িত্ব-পালনে সমান আগ্রহ থাকিবে, যুদ্ধ জয় একমাত্র তখনই সম্ভব হয়। এই সাধারণ সত্য কথাটী তোমরা কদাচ ভুলিও না।

অনেক দিন কতকগুলি লোক একসঙ্গে থাকিয়া নিত্য নূতন ঝগড়া পাকায়, নিত্য নূতন স্বার্থের গণ্ডীর সৃষ্টি করিয়া ঊর্ণনাভের তন্তুতে জড়ায় বলিয়াই অধিকাংশ সরকারী চাকুরীতে দুই চারি বছর পরে বদলীর একটা নিয়ম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তোমরা সেই পরিবর্ত্তনের হাওয়াটা সৃষ্টি করিয়া লইতে পার, সঙ্ঘের মধ্যে নিত্য নূতন রক্তের আমদানী দ্বারা। এই কথাটী এখন তোমাদের ভাবার খুব প্রয়োজন।

আমি চাহি প্রেমের বিস্তার, তোমরা করিবে দ্বেষের অনুশীলন। আমি চাহি, সকলের ক্ষুদ্র-বৃহৎ যাবতীয় শক্তির একত্র সমাবেশ এবং

যুগপৎ প্রয়োগ, তোমরা করিবে শক্তির বিশ্লেষণ, ভিন্নতা-সাধন, যাহা মিলনের ঘোর পরিপন্থী। এইভাবে তোমাদের সহিত আমার জীবনব্যাপী ট্যাগ্-অব-ওয়ার চলিতে পারে না। আমি যাহা চাহি, তোমরাও তাহাই চাহিতে পার কি না, একবার সকলে ভাবিয়া দেখ। তোমাদিগকে স্বাধীনভাবে নিজেদের রুচিমত চাহিবার ও পাইবার অধিকার আমি দিয়াছি বলিয়াই, সেই অধিকারকে তোমরা ঠিক আমার উদ্দেশ্যের বিপরীত উদ্দেশ্যে প্রয়োগ করিতে থাকিবে, এই প্রহসন চিরকাল চলিতে পারে না। এখনও তোমরা আত্মপরীক্ষা কর। নিখিল-বিশ্বের সহিত যাহারা এক হইতে চাহে, তাহারা নিজেরা নিজেদের সহিত কেন এক হইতে পারিবে না, এই প্রশ্ন প্রত্যেকে প্রত্যেককে জিজ্ঞাসা কর এবং প্রত্যেকে আগে এই প্রশ্ন নিজেদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়া নিজের কাছ হইতে সত্য ও সরল উত্তরটী আদায় করিয়া লও। নিজেকে যে জানিল না বুঝিল না, সে কোন্ জ্ঞানটুকুর পুঁজিতে বিশ্বের সকলের মনের কথা বুঝিবে এবং বিশ্ববাসী প্রতি জনের মনের মানুষ হইবে? ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৩৪)

হরি-ওঁ

বারাণসী

১৩ই চৈত্র, ১৩৭২

কল্যাণীয়েষু:—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

তোমার সম্পর্কে অনেকের মুখেই প্রশংসা-বাণী শুনিতে পাইতেছি। তুমি কাজ করিয়া যাইতেছ জানিয়া বড়ই সুখী হইলাম। কথা ত' সকলেই প্রায় কহিতে পারে, কাজ কিন্তু সকলে পারে না। যাহারা পারে, তাহাদের উপরে পরমেশ্বরের বিশেষ অনুগ্রহ বর্ষিত হইয়াছে বলিয়া মনে করিতে হইবে।

তোমার সৎকর্ম্মে রুচিকে তুমি ভগবদাশীর্ব্বাদ বলিয়া জানিও। তাহা হইলেই মানুষের প্রশংসা তোমাকে স্ফীত বা অহংকৃত করিতে পারিবে না। নিরহঙ্কার সুবিনীত কর্ম্মীই প্রকৃত কর্ম্মী। গর্ব্ব না থাকায় সে নির্ভুল ভাবে সকল কাজ করিতে পারে। কাজ নির্ভুল ভাবে হইবার দরুণ কাজের পরিমাণ ও সুফলের স্থায়িত্ব অধিক হয়।

কাজ করিতে থাক প্রচণ্ড উদ্যমে, অদম্য উৎসাহে, নিরলস প্রয়াসে। তবে ত' মানুষের মনকে তোমাদের আদর্শে বিশ্বাসী এবং উদ্বুদ্ধ করিতে পারিবে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৩৫)

হরিওঁ

বারাণসী

১৩ই চৈত্র, ১৩৭২

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

আশীর্ব্বাদ করি, দ্রুত সুস্থ হও। আমার পরিশ্রমের অনুকরণে

অতিশ্রম করিয়া তুমি অসুস্থ হইয়াছ, এইরূপ অনুমান করিয়া বড়ই মর্ম্মপীড়া পাইলাম। আমি যে এখনো অসুরের মত শ্রম করি, তাহা কেবল শ্রম-করা আমার স্বভাব বলিয়া। তোমরা পরিশ্রমী হও, কিন্তু অতিশ্রম করিও না। তোমরা শ্রমকারী সহকর্ম্মীর সংখ্যা-বৃদ্ধিতে মন দাও, প্রত্যেকের সহিত প্রত্যেকের সৌভ্রাত্র ও সৌহৃদ্য বর্দ্ধিত কর এবং সকলকে অল্প অল্প শ্রম দিয়াও মহৎ কর্ম্মে যুগপৎ আত্মনিয়োজিত হইতে প্রেরণা দাও। একজন অসাধারণ পুরুষ অতিশ্রম দিয়া যাহা হয়ত দশ বছরেও করিতে পারিলেন না, তোমরা সকলে যুগপৎ অল্প অল্প শ্রম দিয়া তাহা ছয় মাসে সম্পাদন করিয়া জগতে সুমহতী কীর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া যাইতে সমর্থ হইবে। মানুষের দুঃখ দূর করার চাইতে বড় সংকীর্ত্তি আর কিছু নাই। তাজমহল বা কোণারকের মন্দির-প্রতিষ্ঠা যাহা করিতে পারে নাই, পরদুঃখকাতর সত্যিকারের মানুষ তাহা করিতে পারে, করিবে। তোমরা দুঃখের সাগরে বটপত্রে শায়িত নারায়ণকে ক্ষুধা, ব্যাধি, অপমৃত্যু ও অপমান হইতে রক্ষা কর।

তুমি যে খণ্ডজাতীয় সম্প্রদায়টীর ভিতরে কাজ করিতেছ, ইহারা কয়েক শতাব্দী ধরিয়াই পরমেশ্বরে ভক্তিমান। প্রথাগত ভাবেই ইহারা ঈশ্বরের নাম-কীর্ত্তনাদিতে রুচিমান। তবে, ভক্তি অনেককে গোঁড়া করে, কাহাকেও কাহাকেও উদার করে। আমার স্রষ্টা সর্ব্বজীবেরই স্রষ্টা, এই বিশ্বাস যাহার দৃঢ় হয়, সে সর্ব্বজীবে সৌভ্রাত্র না দিয়া পারে না। উদার ভক্ত অন্যের মতামতে এই ভাবিয়াই অশ্রদ্ধা করেন না যে যাঁহাকে তিনি পরমোপাস্য বলিয়া ভজনা করিতেছেন, তাঁহাকেই অন্য মতাবলম্বীরা নামান্তরে, ভাবান্তরে, রূপান্তরে বা প্রথান্তরে ভজনা করিতেছেন। কিন্তু গোঁড়া ভক্ত অন্যের মতকে অসত্য মনে করে,

অন্যের উপাস্যকে হেয় জ্ঞান করে, অন্য মতের পথিকদিগকে অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখে। ফলে, তাহাদের অশেষ ঈশ্বর-প্রেম থাকা সত্বেও তাহারা ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি অসংখ্য মানুষকে বিদ্বেষ করে। ঈশ্বর-প্রেমের সহযোগী রূপে মানুষের প্রতি অপ্রেম জগতে বাড়িতে থাকিলে ইহাদের পূজিত পরমেশ্বর আবার অবজ্ঞাতদের দৃষ্টিতে হেয় হইয়া পড়িবেন কি না,—এই কথাটা ইহাদের ভাবিবার অবসর ঘটে না। অবসরের এই অভাব নিদারুণ কূপমণ্ডুকতার সৃষ্টি করে, যাহা একই বিগ্রহের পূজকদিগকে পর্য্যন্ত লাঠালাঠিতে প্রবৃত্ত না করাইয়া ক্ষান্ত হয় না। গোঁড়ামি ইষ্ট-নিষ্ঠারই একটা বিকৃত রূপ, আবার কখনো কখনো উদারতা ইষ্ট-নিষ্ঠাহিনতারই বিকট মূর্ত্তি। যে যাহাই করুক, নিজ নিজ সাধনে নিষ্ঠা একান্তই প্রয়োজন। সাধন-নিষ্ঠাহীন উদারতার কোনও মূল্যই নাই।

তুমি যেই সাম্প্রদায়টীর ভিতরে আমাদের ভাব প্রচার করিতেছ, তাঁহারা ইষ্ট-নিষ্ঠায় গোঁড়া বলিয়াই এতদিনেও মুসলমান বা খ্রীষ্টান হইয়া যান নাই। ইসলাম ও খ্রীষ্টীয় ধর্মের প্রচার-ব্যবস্থা এত ব্যাপক এবং সঙ্ঘবদ্ধ, আর এই দুই ধর্ম্মের প্রথম প্রকাশ হইতেই প্রচারশীলতা ও প্রসারণ-পরায়ণতা ইহাদের এমনই অসাধারণ বিশেষত্ব যে, যে-সকল জাতির ইষ্ট-নিষ্ঠার বুনিয়াদ খুব শক্ত নহে, তাহারা অতি অল্প সময়ে এই দুই ধর্ম্মের মধ্যে একটীর একান্ত আশ্রিত হইয়া পড়িয়াছে। ইতিহাসের ঘটনাবলী এই কথার সাক্ষ্য বহন করে। কিন্তু যাহারা ইষ্ট-নিষ্ঠায় গোঁড়া, কোনও প্রলোভন বা বিভীষিকা, কোনও যুক্তিজাল বা দার্শনিকতা, কোনও কৌশল বা ছলচাতুরী, কোনও অনতিক্রমণীয় বিপত্তি বা বিপ্লব তাহাদের ধর্ম্ম-বিশ্বাস টলাইতে পারে নাই। এই

স্থানেই বিশ্বাসী ব্যক্তির গোঁড়ামির সব চেয়ে উজ্জ্বলতর মূর্ত্তিটির আবরণোন্মোচন ঘটিয়াছে। কেহ গোঁড়া বলিয়াই তাহাকে এক কথায় নিন্দনীয় করিবার উপায় নাই।

ধর্ম্মবিষয়ে অত্যন্ত গোঁড়া একটী সম্প্রদায়ের মধ্যে তুমি কাজ সুরু করিয়াছ। আমি চাহি যে, তুমি যেন ধীরপদসঞ্চারে ক্রমশঃ তোমার অগ্রগমন অব্যাহত রাখিয়া চলিতে পার, অতি দ্রুততায় তোমার যেন পদস্খলন না হয়, অতি ব্যস্ততায় তুমি যেন ইহাদের বিশ্বাসের পাত্রতা অর্জ্জনে অক্ষম না হও, হঠাৎ সংঘর্ষে ইহাদের মধ্যে কোনও বিরোধ-বিক্ষোভ সৃষ্টি যেন করিয়া না বস। তোমাদের ধর্ম্ম-প্রচারের ভঙ্গী নিন্দনীয় হওয়া উচিত নহে। তাহাকেও বাগে আনিবার জন্য, ফাঁদে ফেলিবার জন্য তাহারা অবলম্বিত কোনও কুরীতি বা কুরুচিকে আপাততঃ উপেক্ষা করিয়া বহুরূপী-সাজে সাজিয়া তাহাকে প্রলুব্ধ করাও যেমন দোষ, আবার কাহারও আর্থিক, সামাজিক, সাংঘিক বা পারিবারিক দুর্ব্বলতার সুযোগ নিয়া তাহাকে নিজের গণ্ডীতে আনিয়া বন্দী করিবার চেষ্টাও তেমন অনাদর্শ ব্যাপার। বুদ্ধির এই সচেতনতা কদাচ হারাইও না। যাহারই সংস্পর্শে যাইতেছ, প্রেমবশাৎ যাইতেছ, অন্যতর প্রচ্ছন্ন উদ্দেশ্য-বিশেষের প্ররোচনায় নহে, এই কথাটী তোমাকে স্পষ্ট করিয়া মনে রাখিতে হইবে। তোমার জীবনাদর্শের মহীয়ান্ আলেখ্য প্রত্যেকের নয়ন-সম্মুখে স্পষ্ট করিয়া খুলিয়া ধর, তোমার সাধনাদর্শের সুরভি চন্দন-গন্ধ তাহার অজ্ঞাতসারে গোপন-পদ-সঞ্চারে তাহার মানস-নাসায় প্রবেশ করুক, সে নিজে নিজে একান্তই নিজের প্রাণের আগ্রহে দিনের পর দিন তোমার নিকটতর হইতে থাকুক, কৃত্রিম বিজ্ঞাপনীয় প্রচার-কৌশল হইতে বিমুক্ত সরল স্বচ্ছ তোমার

মন তাহাকে তাহার প্রকৃত শান্তির আশ্রয়টুকু খুঁজিয়া বাহির করিতে নিয়ত সংগুপ্ত প্রেরণা দিতে সমর্থ হউক। এই মহদুদ্দেশ্য সংসাধনের জন্য তোমাকে মনে মুখে এক হইতে হইবে, চরিত্রের শুভ্রতায় তোমাকে গগনবিদারী হিমাচলের তুষার-কিরীটের মত সুন্দর, মনোহর, অদ্বিতীয় ও ভাস্বর হইতে হইবে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৩৬)

হরি-ওঁ

মঙ্গলকুটীর, পুপুন্‌কী
মঙ্গলবার, ১৫ চৈত্র, ১৩৭২
২৯।৩।৬৬

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

এমন একটা জটিল পরিস্থিতিতে পড়িয়াছি যে, কোমরে হিপ-জয়েণ্টে এত বড় একটা নিদারুণ চোট পাইয়াও কলিকাতা, পুপুন্‌কী আর বারাণসী দৌড়াদৌড়ি করিতে হইতেছে। তোমরা লিখিতেছ, বিশ্রাম করুন বাবা। কিন্তু আমার বিশ্রাম নিতে হইলে তোমাদের ঘাড়ে শ্রমভার কিছু-না-কিছু নিতে হয়। স্নেহময় বারাণসীতে কাজের চাপে ন্যুব্জদেহ হইতে বসিয়াছে, সাধনা সারাদিন রৌদ্রে দাঁড়াইয়া কলিকাতার নির্ম্মাণকার্য্য করিতেছে, ঐ রৌদ্রতপ্ত মাঠের মধ্যেই দাঁড়াইয়া আহার সারিতেছে, জলপান করিতেছে, কিন্তু তোমাদের নিজ নিজ কর্ম্ম-ক্ষেত্রে তোমরা কে কোথায় কি করিতেছ? স্নেহময়, সাধনা,

স্বরূপানন্দ এই তিনটী বিনা মাহিনার মজুর মরিয়া গেলে তোমাদের সঙ্ঘ যে একটা গল্পবাজ, কল্পনাবিলাসী, অলসের আড্ডায় পরিণত হইয়া যাইবে, এ কথা ভাবিয়া তোমাদের কি একটুও দুঃখ হয় না?

অন্যান্য হাজার কাজ ছাড়িয়া দিলেও যুবক-সমাজের মধ্যে যে করণীয়টুকু রহিয়াছে, তোমরা, শিক্ষক-অখণ্ডেরা সেই কাজটুকুতেই কি মন দিতে পার না? এ কাজ ধরিয়াছিলাম তরুণ কৈশরে, কর্ম্মীদলও গড়িয়া লইয়াছিলাম। সেই সময়ের সতীর্থেরা অনেকেই মহাপ্রস্থানের পথে চলিয়া গিয়াছেন। আমি এখনো কাজ করিয়া যাইতেছি কিন্তু আমি সঙ্গীহীন। সংসারের সহস্র সমস্যাকে তোমরা এমন বড় করিয়া দেখিতেছ যে, সপ্তাহে একটী ঘন্টা করিয়া সময় তোমরা এই কাজটীতে নিয়োগ করিতে পারিতেছ না, যে কাজটী না হইলে দেশের সকল কল্যাণের মূলদেশ পোকায় কাটিয়া শেষ করিয়া ফেলিবে। একা আমি জগদুদ্ধার করিব, তোমরা শুধু জয়ধ্বনি দিবার জন্য চারিদিকে দাঁড়াইয়া থাকিবে,—ইহা অসহনীয় পরিস্থিতি। আজ যখন তোমরা অনেকেই এই জল্পনায় নামিয়াছ যে, আমার এই দেহের পতনের পরে কি ভাবে কি হইবে, তখন তোমাদের সর্ব্বাগ্রে যে সেই কাজটীতে হাত দেওয়া প্রয়োজন, যে কাজটী আমি আকৈশোর করিয়া আসিয়াছি, একথা কবে তোমাদের প্রতিজনের বোধগম্য হইবে?

আজ আমি ত্রিপুরা রাজ্য হইতে একটী অপদার্থের এক পত্র পাইলাম। সে নিজের মতামতের অনুকূলে জনমত সৃষ্টিতে লাগিয়া গিয়াছে। সে বুঝিয়া নিয়াছে যে, বর্ত্তমান স্বরূপানন্দ-শরীরের পতন আসন্ন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে দিল্লীর মসনদ ত' অধিকার করিতে হইবে! কে করিবে? যে স্বরূপানন্দের কদাচ আস্থাভাজন হয় নাই, যে গুরু-

নিন্দাকে পরম পাথেয় জানিয়া দিনের পর দিন তাহাই সংগ্রহ করিয়াছে, যে নিজে শ্রমকুণ্ঠ, অলস ও গল্পদালাল, চরিত্রের অমূল্যধন অর্জ্জনে যাহার বিন্দুমাত্র চেষ্টা নাই বা কদাচ ছিল না, মিথ্যা এবং চৌর্য্য যাহার স্বভাবের সাধারণ বিশেষত্ব এমন উন্মত্ত-প্রলাপী ব্যক্তিরও সমর্থনকারী মিলে তার মূত্রপূরীষোৎসর্গকেও বাহবা দিবার লোকের অভাব হয় না, ষাঁড় ক্ষেপাইয়া দিয়া আমোদ দেখিবার লোভে কেহ কেহ তাহা করিতেছেও। কিন্তু অলস, বিপ্রলাপী, নানা অসৎ গুণের আকরস্বরূপ এই সকল লোকই যদি পরিণামে তোমাদের নেতা হইয়া বসিবার জন্য ভণ্ডামির হরিওঁ কীর্ত্তন সুরু করিয়া দেয়, তোমরা মূর্খের দল তাহাদেরই কি পদরজ ভক্ষণ করিয়া জীবন সার্থক করিবার চেষ্টা করিবে না? উদ্যত পৌরষে পূর্ণ পুরুষোচিত শৌর্য্যকে নিজ নিজ জীবনের অনুশীলনে আন নাই বলিয়া তোমরা ত' অনেকেই পুর্ব্বপুরুষগণের ভ্রান্ত আচরণ অনুসরণ করিয়া মালপোয়া-লোভী এই সকল অকৃতজ্ঞ জানোয়ারকে পূজার অর্ঘ্য দিবে। অথচ তোমাদের আসল কাজ, দেশের চারিত্রিক মানের উন্নয়ন। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতাধিকারী একদল ভ্রান্তবুদ্ধি নেতা সাধারণ মানুষের ক্রয়-ক্ষমতার অনেক উর্দ্ধে নিয়া জীবনের মানোন্নয়নের বিকৃত চেষ্টা করিয়া ভারতবর্ষকে ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স ও আমেরিকার সমান সভ্য করিয়া তুলিবার কীর্ত্তি অর্জ্জনে আগ্রহী হইয়াছেন, যাহার ফলে দেশে কৃষির উন্নতি হয় নাই কিন্তু কৃত্রিমভাবে জন-প্রজনন-হ্রাসের অনৈতিক আবহাওয়া নরনারীমাত্ররই মন কলুষিত করিয়া তুলিতেছে। ইহা সত্য বটে কিন্তু যতক্ষণ চরিত্রের মান উন্নীত না হইতেছে, ততক্ষণ দেশের কোনও উন্নতিই উন্নতি

নয়। সেই দিকে তোমরা নজরই দিতেছ না। কেহ কেহ এমনও বলিতেছ যে, ঐ চেষ্টা করিয়া কি হইবে, দেশের নৈতিক উন্নতি আর হইবার উপায় নাই।

পরাজিতের এই হেয় মনোভাব তোমরা বিসর্জ্জন দাও। বাপ-মা পুরা-পেট খাইতে দিতে পারে না বলিয়া দেশ-ব্যবচ্ছেদের বলিস্বরূপ যে কঙ্কালসার ছাত্রছাত্রীগুলির তোমাদের বিদ্যালয়ে কায়ক্লেশে পড়িতে আসে, সর্ব্বাগ্রে তাহাদের লইয়া কাজ সুরু কর। মোজেস্ যে একদল ইহুদী ক্রীতদাসের ঘরেই জন্ম নিয়াছিলেন এবং একদা জগদ্বাসীকে পরমেশ্বরের দশ আজ্ঞা শুনাইতে সমর্থ হইয়াছিলেন, এই প্রেরণাদায়িকা কথাটী স্মরণে রাখ। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৩৭)

হরি-ওঁ

মঙ্গলকুটীর, পুপুন্‌কী
১৮ চৈত্র, শুক্রবার, ১৩৭২
১-৪-৬৬ ইং

কল্যাণীয়েষুঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

তোমরা আমাকে ভালবাস, ইহা আমি জানি। কিন্তু শুধু ভালবাসাতেই কাজ হইবে না। আমি চাহি তোমরা সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া কাজে লাগ। যে কাজ আমার প্রিয়, যে কাজ ভগবানের প্রিয়, যে কাজে দেশ, জাতি, সমাজ ও জগতের কল্যাণ, যে কাজের স্বাভাবিক

ফল সহজ আত্মপ্রসাদ, আত্মোন্নতি, আত্মোৎকর্ষ এবং জগন্মঙ্গল, তোমরা সেই কাজে লাগ। কাজ করিলাম না, কেবল ভালই বাসিলাম, এমন ভালবাসার কদর এ যুগে নাই। একাধারে তোমাদিগকে মেরী এবং মার্থা হইতে হইবে। কেবল শ্রীপ্রভুর মুখারবিন্দ দেখিয়া নয়নাশ্রু বিসর্জ্জন দিলেই চলিবে না। শ্রীপ্রভুর প্রত্যক্ষ সেবায় লাগে, এমন শ্রমও দিতে হইবে। শুধু ভক্তির প্লাবন আমার দিল্‌চশ্‌পী নহে, কর্ম্মের ঝঞ্ঝার সহিত প্রেমের প্লাবনই আমি চাহি। নিষ্কর্ম্মার অলস ভক্তি ভাবালুতার দিক্ দিয়া যতই মনোহারী হউক, জীবন-সংগ্রামে টিকইয়া রাখিবার পক্ষে পর্য্যাপ্ত নহে ভক্তিপন্থীদের প্রতি এই মন্তব্য আক্রোশমূলক মর্ম্মাঘাত নহে। তাঁহাদের অবলম্বিত পথের সহিত আমার কোনও বিরোধ নাই কিন্তু মন্দিরের পূজককে কেবল পূজায় নিমগ্ন থাকিলেই চলিবে না, দুষ্ট ও দুর্ব্বৃত্তের হাত হইতে মন্দির রক্ষার পৌরুষও প্রয়োজন। এমন নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষটীর প্রতি উদাসীন হইয়া যাঁহারা ভক্তির চর্চ্চা করেন, তাঁহারা ভগবানের অশেষ স্নেহের পাত্র হইতে পারেন কিন্তু দেশ, সমাজ, ইতিহাস ও ভাবিকাল তাঁহাদিগকে ক্ষমা করে না।

ভালবাসার সহিত কর্ম্মের সম্পর্ক অহি-নকুল পর্য্যায়ের নহে। ভালবাসিয়াও কর্ম্ম করা যায়। বরং ভালবাসার গুণে সকাম কর্ম্ম নিষ্কাম হয়, সমল কর্ম্ম নির্ম্মল হয়, দুর্ব্বল কর্ম্ম সবল হয়, নিরর্থক কর্ম্ম সার্থক হয়। প্রকৃতই যে ভালবাসে, তাহার কর্ম্ম দোষহীন, ত্রুটিহীন, অপূর্ণতাহীন ও সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হয়। তোমরা ভালও বাস, কাজও কর। ভালবাস বলিয়া কাজ ছাড়িয়া দিয়া মিথ্যা বৈরাগ্যের আশ্রয় নিও না।

এযুগে সঙ্ঘবদ্ধতার প্রয়োজন প্রতিটী পদক্ষেপে। অপরের সহিত মিলিত হইয়া কাজ করার ভিতরে কেবল শক্তি বৃদ্ধি রহিয়াছে, তাহা নহে, অকল্পনীয় আনন্দও আছে। হারিলাম ত' সবাই মিলিয়া হারিলাম,—অন্তরের গ্লানি এক কণাও থাকে না। জিতিলাম ত' সবাই মিলিয়া জিতিলাম,—প্রাণঢালা আনন্দলুণ্ঠনের মুখে স্পর্দ্ধিত অহমিকা আসিয়া বাধা স্বরূপে দাঁড়াইতে পারে না। প্রতিজ্ঞা কর,—"বাঁচিব সকলকে লইয়া, মহদ্‌ব্রত পালন করিতে গিয়া মরিতে হয় ত' সকলকে নিয়া মরণমধুর সুখরসাস্বাদন করিব। প্রেম আমাদের সমগ্র জীবনকে ম্রক্ষিত করিয়া দেউক। যাহা কিছু ভাবি, বলি, করি, সবই যেন সকলের জন্য হয়।" ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৩৮)

হরি-ওঁ

মঙ্গলকুটীর

১৮ চৈত্র, ১৩৭২

কল্যাণীয়াসু:—

স্নেহের মা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

তোমার চেষ্টা ও উদ্যমে ঐ অঞ্চলের নারী জাতির ভিতরে ঈশ্বরাভিমুখিতা ও সংঘবদ্ধতার ভাব জাগরিত হইতেছে জানিয়া সুখী হইয়াছি। নিজেকে জাহির না করিয়া নীরবে যাহারা কাজ করে, তাহারা সত্যই ধন্য। তোমাদের আজ একতা ও সঙ্ঘবদ্ধতার অত্যধিক প্রয়োজন পড়িয়াছে। সঙ্ঘবদ্ধতার মানেই হইতেছে একে অন্যকে

সহায়তা করিয়া দুর্ব্বলতা মুক্ত করা, অভিঃ করা, উদ্যম-পরায়ণ করা। একে অন্যকে সহায়তা করিতে হইলেই চাহি পরস্পরের মধ্যে অকুণ্ঠ বিশ্বাস আর অনাবিল প্রেম। তোমাদের প্রতিজনের চিন্তা, বাক্য ও কর্ম্ম—সকলের বিশ্বাসের প্রবর্দ্ধক ও প্রেমের উদ্দীপক হউক। হিংসা-নিন্দা-ঈর্ষ্যা-আক্রোশ তোমরা প্রত্যেকের মন হইতে সমূলে উৎপাটিত কর। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৩৯)

হরি-ওঁ

মঙ্গলকুটীর

রবিবার, ২০শে চৈত্র, ১৩৭২

৩-৪-৬৬ ইং

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

১২ই চৈত্র তারিখে তোমাকে পত্র লিখিতে বসিয়াছিলাম। আর, সেই পত্র ডাকে দিতে বসিয়াছি ঠিক আট দিন পরে। এই আটটা দিনে তোমার পত্রখানা সুরু করিয়াও শেষ করিতে পারি নাই। অথচ, কথা আমার সামান্য, কত সংক্ষিপ্ত।

তোমাদের এখন সঙ্ঘবদ্ধ হওয়াই সবচেয়ে বড় প্রয়োজন। পূর্ব্বাচার্য্যদের শিক্ষা-দীক্ষা তোমাদিগকে কেবলই disintegrate করিয়াছে, কেবলই করিয়াছে খণ্ড আর বিখণ্ড, করিয়াছে টুক্‌রা টুক্‌রা,

ভাগ ভাগ। যিনি যত অধিক ভাগ অঙ্ক কষিয়াছেন, তিনি তত বেশী গুণী সমাজ-সংস্কারক বা সমাজ-সংস্থাপক রূপে পূজিত হইয়াছেন। তৎকালে হয়ত চারিটি ভাগ শত ভাগে, শত ভাগ সহস্র ভাগে বিভক্ত হইবার প্রয়োজন ছিল। সুতরাং এক কথায় পূর্ব্বাচার্য্যদিগকে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করাইতে পারি না। কিন্তু অতিরিক্ত ভাগের ফলে তোমরা যোগ হইতে বিযুক্ত হইয়াছ, বাড়িতে পার নাই, বড় হইতে পার নাই। মহান্ পূর্ব্বপুরুষদের সদুদ্দেশ্য-প্রণোদিত কোনও ব্যবস্থার জন্য তাঁহাদের উপরে রাগ করিয়া লাভ নাই কিন্তু ঐ সকল ব্যবস্থার ফলে তোমরা হইয়াছ ঐক্যহীন, সংহতিহীন, পরস্পরের সহিত প্রাণবন্ত সকল প্রকার সংস্রব হইতে বিচ্যুত, নিজেদের ঘরে নিজেরা এক-ঘরে, এক একটী আত্মকেন্দ্রিক ভিক্ষুক। দস্যু অপেক্ষা ভিক্ষুক ভাল, একথা সত্য হইতে পারে কিন্তু আত্মশক্তিতে নির্ভরহীন পরানুগ্রহজীবীর চেয়ে আত্মবলদর্পিত ডাকাত যে ভাল, একথাও নিতান্ত মিথ্যা নহে। অর্থাৎ ঐক্যের অনুশীলনে একান্ত পরাঙ্মুখ দুর্ব্বল ভিখারীও হেয়, ঐক্যবলে বলীয়ান্ পরস্বাপহারী নির্ম্মল দস্যুও হেয়। প্রশংসনীয় একমাত্র সে, যে একার বলে অসাধ্য-সাধন অসম্ভব জানিয়া ঐক্যবলের অনুশীলন করে এবং ঐক্যলব্ধ মহাশক্তিকে প্রয়োগ করে সঙ্কীর্ণ স্বার্থ সাধনার্থ নহে পরন্তু নির্ব্বিশেষ জগৎকল্যাণে।

সঙ্ঘবদ্ধতা আত্মশক্তিতে বিশ্বাস বাড়ায়। আত্মশক্তিতে বিশ্বাস মানুষ হিসাবে বাঁচিয়া থাকিবার সামর্থ্য বাড়ায়। ইতর-প্রাণীরাও ত' জীবনধারণ করে। মানুষের জীবনধারণ ঠিক তাহাই নহে। মানুষের মত বাঁচিয়া থাকাই প্রকৃত বাঁচা। যে-কেহ ভ্রূকুটি করিলে সঙ্গে সঙ্গে

যাহাদিগকে ভিটামাটি ছাড়িয়া পলাইতে হয়, উৎপীড়ক আসিয়া লাঞ্ছনা দিলে যাহারা প্রতীকার-চেষ্টা না করিয়া দস্যুর পদতলেই পুষ্পাঞ্জলি ঢালে এবং শাস্ত্রোক্ত সাধুবচন সমূহ আবৃত্তি করিয়া উচ্চ আদর্শের মঙ্গলশঙ্খ বাজাইতে থাকে, তাহারা জ্ঞানী হইতে পারে, চতুর হইতে পারে, ভাবুক, কবি, বক্তা ও দার্শনিক হইতে পারে কিন্তু মানুষ হিসাবে অতীব নগণ্য। আত্মশক্তিতে বিশ্বাসের অভাব হইতেই শিক্ষিত মানুষের মধ্যে এই জাতীয় খচ্চরদের আবির্ভাব হয়, যাহারা গাধাও নহে, ঘোড়াও নহে।

অবিলম্বে তোমরা সঙ্ঘবদ্ধ হও এবং আত্মশক্তির পরিবর্দ্ধনে প্রয়াসী হও। দিন বৃথাই চলিয়া যাইতেছে, সময় নষ্ট করিয়া কোনও লাভ নাই। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৪০)

হরি-ওঁ

মঙ্গলকুটীর

২০ চৈত্র, ১৩৭২

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

যখনই দেখিতে পাই যে, তোমাদের ভিতরে ত্যাগ আসিয়াছে, স্বার্থপরতা কমিতেছে, সৎকার্য্যে রুচি আসিয়াছে, দশজনকে লইয়া সৎ-প্রয়াসে আত্মোনিয়োগ করিবার ঝোঁক বাড়িতেছে, তখনই অনুভব

করি যে, তোমাদের চিত্তশুদ্ধিও আসিয়াছে। চিত্তশুদ্ধি ছাড়া ত্যাগ আসে না। সদুদ্দেশ্যে স্বার্থত্যাগ করিতে করিতে চিত্তশুদ্ধি আসে, ইহা সত্য কিন্তু ইহা বলকৃত। কিন্তু চিত্তশুদ্ধির ফলে যখন ত্যাগ আসে, তখন ইহা স্বতঃপ্রবৃত্ত।

পরমেশ্বরের নামে মনকে ডুবাইলে এবং নাম-সাধনের কালে তাঁহার চরণে জগতের কোনও স্বার্থলাভের আবেদন না জানাইলে, নিষ্কাম সেই আধ্যাত্মিক উদ্যমের ফলস্বরূপে হঠাৎ পাথর ফাটিয়া জলধারা বহির্গত হইতে থাকে। এই জলধারারই নাম চিত্তশুদ্ধি।

তোমরা প্রতিজনে শুদ্ধচিত্ত হও, এই আশীর্ব্বাদ করি। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৪১)

হরি-ওঁ

মঙ্গলকুটীর
সোমবার ২১ চৈত্র, ১৩৭২
৪-৪-৬৬

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তোমাদের প্রতিজনের জীবন নামের আনন্দ-রসে পরিষিক্ত হউক। ভগবানের মধুর আস্বাদ তোমরা কণায় কণায় আস্বাদন করিয়া কৃত কৃতার্থ হও। নাম করিতে করিতে নামের শক্তিতে শক্তিমান হও।

নামের স্নিগ্ধতায় স্নিগ্ধ-সুশীতল-তনু হও। স্থির হও, ধীর হও, বীর হও। ভগবানের নাম যে কেবল পরপদবিদলিত দুর্ব্বলেরাই চিরকাল করিয়াছে, তোমাদের জীবন এই অপবাদকে খণ্ডিত করুক।

নাম কর আর কাজ কর, নাম করিতে করিতে কাজ কর, কাজ করিতে করিতে নাম কর। নাম করা আর কাজ করাকে যুগপৎ ও অভেদ করিয়া লও। কাজের সময়ে নাম ভুলিও না, নামের সময়েও কাজ ভুলিবার দরকার নাই। যাঁহার নাম করিতেছ, তাঁহারই ত' প্রীত্যর্থে তোমার জীবনের সকল কাজ। ধ্যান, জপ, কীর্ত্তন করিতে বসিলে কাজের চিন্তা আসিয়া ভর করে, ইহা চিত্তবিক্ষেপের একটী অবস্থা। কিন্তু যাহার সর্ব্বকার্য্য একমাত্র পরমেশ্বরের তৃপ্ত্যর্থ, তাহার নামসাধন-কালে কাজের চিন্তা আসিয়া পড়িলে তাহা বিক্ষেপের কারণ হয় না। সব কাজ ভগবানের জন্য কর।

নাম-সাধকেরা অকাতরে ভিক্ষুক হইয়াছে, এইরূপ দৃষ্টান্তই এদেশে অধিক। একদা চিত্তের নম্রস্বভাব আয়ত্ত করিবার জন্য ভিক্ষাগ্রহণ প্রয়োজন ছিল। কিন্তু আজিকার নাম-সাধক নিজ জীবিকার দিক দিয়া পূর্ণ স্বাবলম্বী হইবেন। আজিকার দিনে সার্ব্বজনিক অর্থনীতিকে বিপর্য্যস্ত করিয়া জীবন-যাপন ক্ষতিকর এবং অপরাধ-জনক। তোমাদের ধর্ম্মজীবন যেন অন্য মানুষের স্কন্ধে তোমাদের জীবনোপায় সংগ্রহের ভারার্পণ না করে, ইহা দেখিয়া চলিও। আমি নিজের জীবনে ইহারই ত' দৃষ্টান্ত স্থাপনের চেষ্টা করিয়া আসিতেছি।

জনমঙ্গল-কার্য্যে তোমরা প্রত্যেকে লাগিয়া যাও। বাহাদুরী নিবার

জন্য নহে, অন্তরের প্রেমের তাগিদে কাজে নামো। সবাইকে ভালবাস। সেই ভালবাসা তোমার কর্ম্মযোগের প্রেরয়িতা হউক। কর্ম্মযোগ শ্রেষ্ঠ যোগ কিন্তু প্রেমহীন কর্ম্ম কর্ম্মও নহে, যোগও নহে। নিঃস্বার্থ নিষ্কাম প্রেম অতি সাধারণ কর্ম্ম বা অতি নগণ্য সেবাকে অশ্বমেধযজ্ঞে রূপান্তরিত করে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৪২)

হরি-ওঁ

মঙ্গলকুটীর

২১শে চৈত্র, ১৩৭২

কল্যাণীয়েষু:—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

উত্তর কাছাড়ের ছোট ছোট চারি পাঁচটী রেলের গঞ্জ, যেখানে বাসিন্দা খুবই কম, তাদের মধ্যে তোমাদের স্থানটী অনেকের চেয়েই ক্ষুদ্র। কিন্তু তোমরা তোমাদের উদয়াস্ত অখণ্ড-মহানাম কীর্ত্তন যেরূপ সফলতার সহিত সম্পাদন করিয়াছ, তাহাতে তোমাদিগকে অশেষ প্রশংসা করিতে হয়। দুঃখ বোধ করিতেছি তাহাদের জন্য, যাহারা এত কাছে থাকিয়াও তোমাদের কণ্ঠে কণ্ঠ মিলাইয়া হরিওঁ গাহিবার জন্য সামান্য কয়েক গণ্ডা পয়সা খরচ করিয়া যোগদান করিতে আসিল না। প্রকৃত সাত্ত্বিকতার অভাবেই এইরূপ অনাগ্রহ জন্মিয়া থাকে। সকলের মধ্যে সাত্ত্বিকতার সৃষ্টি হউক, নিয়ত এই প্রার্থনা করি।

ইহার পরে তোমরা যখন অনুরূপ সাত্ত্বিক অনুষ্ঠানসমূহ পুনরায়

করিবে, এখন যাহারা যোগ দিতে আগ্রহী হইল না, তখনও তাহারা এইবারকার মতন দূরেই থাকিবে, এইবারকার দৃষ্টান্ত দেখিয়া তোমরা এই ধারণা করিও না। মানুষ চিরকাল সৎপথে সমান উদাসীন থাকে না। তোমার পত্রে উল্লিখিত স্থানগুলির লোকদের সঙ্গে তোমরা বরাবর যোগাযোগ রক্ষা করিয়া চলিও। যাঁহারা ইহজন্মে কদাচ তোমাদের হাতে হাত, তোমাদের কাঁধে কাঁধ, তোমাদের কণ্ঠে কণ্ঠ, তোমাদের প্রাণে প্রাণ মিলাইবেন না, তাঁহাদের সম্পর্কেও তোমরা হতাশ হইও না। হতাশা দুর্ব্বলের নীতি, নিয়ত আশাশীলতা সবলের ধর্ম্ম। তোমরা সবল হও এবং সক্রিয় হও। উল্লিখিত স্থানগুলিতে তোমরা ঘন ঘন অখণ্ড-সংহিতা-পাঠপ্রকল্প এবং হরিওঁ নাম-কীর্ত্তনের পরমপাবনী বন্যা লইয়া উপস্থিত হইতে থাক। প্রত্যেকটী স্থানে বছরে তিন চারিবার করিয়া অভিযান পরিচালন করিতে থাক। সফলতা বা বিফলতার দিকে কণা-মাত্র অভিনিবেশ না দিয়া কর্ত্তব্য কার্য্য সম্পাদনের পরমানন্দ লইয়া কাজ করিতে থাক।

কিন্তু এইজন্য সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন তোমাদের স্থানীয় কর্ম্মীদের মধ্যে দৃঢ়সংবদ্ধ ঐক্য। আর ঐক্য আসে প্রেম হইতে। প্রেম আসে অকপট চিত্তে নামের নিয়ত সাধন হইতে। সাধনের রুচি আসে প্রকৃত সাধকের চরিত্র-চিন্তন হইতে। প্রকৃত সাধকের খোঁজ মিলে একমাত্র ঈশ্বর-কৃপাতে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৪৩)

হরি-ওঁ

মঙ্গলকুটীর
২১ চৈত্র, ১৩৭২

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

বৎসর শেষ হইতে চলিয়াছে, এই সময়ে কোথায় তোমাদের সমগ্র বৎসর ব্যাপিয়া নানা কৃতিত্বের প্রশংসায় মুখরিত করিয়া পত্রাশিস বর্ষণ করিব, আর কোথায় আজ আমি তোমাদিগকে সঙ্কল্প পূর্ব্বক তিরস্কার করিতে আসিয়াছি। আমি যে বারবার কয়েকবার তোমাদের ঐ পার্ব্বত্য অঞ্চলের রেল-সহরটীতে পদার্পণ করিয়াছি, তাহা কি এই জন্য যে, তোমরাই পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ-স্থানাধিকারী? তোমাদের ওখান হইতে সামান্য কিছু গাঁটের পয়সা খরচ করিলে যে সকল রেলের গঞ্জে ট্রেণে বসিয়াই যাওয়া যায়, সেই সকল স্থানের অধিবাসিদের সহিত তোমাদের যাহাতে অন্তরঙ্গতা স্থাপিত হয়, একমাত্র এই উদ্দেশ্যে অনুপ্রাণিত হইয়াই না আমি কয়েকবার তোমাদের স্থানটীতে যাইবার ভ্রমণ-ক্লেশ সহ্য করিয়াছি? শুনিতেছি তোমরা নাকি উত্তর কাছাড় মণ্ডলী সমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান চালাইতেছ এবং ইহাও জানি যে, সংখ্যাবলে তোমরা নিতান্ত তুচ্ছ নহ। কিন্তু মাত্র তিনটী কি চারিটী ষ্টেশন পরে যে নগণ্য স্থানের ভ্রাতারা ফাল্গুনী পূর্ণিমা তিথিতে উদয়াস্ত মহানামকীর্ত্তন করিল, তাহাদের সাগ্রহ আমন্ত্রণ পাইয়াও তোমাদের সহরের প্রতিনিধি রূপে একটী কাক-প্রাণীও কেন সেখানে

গেল না, ইহা বলিতে পার? ইহা তোমাদের দম্ভ, না অবহেলা, ইহা তোমাদের বিস্মৃতি, না অবজ্ঞা, ইহা তোমাদের কর্ত্তব্যে উপেক্ষা না স্বভাবজাত আলস্য,—ইহা আমাকে বলিবে কি? এই ত' হোজাই যাইতেছি একটা ভগ্নাস্থি দেহ লইয়া, কিন্তু তোমরা ত' আমাকে জোর করিয়া ধরিবে, "চলুন বাবা আমাদের সহরে, আমরা আপনাকে সন্দেশ খাওয়াইব, রসগোল্লা গিলাইব।" আমি যে জলের পাইপের উপর পড়িয়া গিয়া হিপ-জয়েণ্টে গুরুতর চোট পাইয়াছি, এই অবস্থায় হোজাই পর্য্যন্ত যাওয়াই যে আমার পক্ষে প্রাণান্তকর হইয়াছে, আমার যে আর কোনও নূতন ভ্রমণ-তালিকা করা এই সময়ে উচিত নহে, এই কথা হাজার বার বলিলেও ত' তোমরা শুনিবে না। কিন্তু বাবা, যেখানে হরিওঁ নাম-কীর্ত্তন হয়, সেখানে আমি সূক্ষ্মভাবে হইলেও অবস্থান করি, এই কথাটী জানিয়াও ত' ফাল্গুনী পূর্ণিমার কীর্ত্তনের নিমন্ত্রণ পাইয়া তোমরা অবহেলা করিয়াছ। তোমাদের আহ্বানে আমি তোমাদের সহরে যাইব কেন? ইহা কি ভাবিয়া দেখিয়াছ?

বাবা হে, ছোট জায়গাগুলিকে ছোট বলিয়া ভাবিতে নাই। ছোট মানুষগুলিকে ছোট বলিয়া অবজ্ঞা করিতে নাই। এই শিক্ষাটুকু লাভ করিবার জন্য কয়েক শতাব্দী কাটাইয়া দিও না। আসল এবং প্রত্যক্ষ সেবার কার্য্যে যোগদান না করিয়া নিজেরা যে নিজেদিগকে খেলো করিয়া ফেলিতেছ, এই কথাটী চিন্তা করিতে চেষ্টা করিও। হোজাইতে দেখা হইলে আমি তোমাদিগকে বৎসরের সেই প্রথম মাসে তিরস্কার করিতে পারিব না বলিয়া মনে করিও না যে, বক্তৃতামঞ্চে যে-ই

যখন যতগুলি ভাল ভাল কথা বল, তাহার প্রত্যেকটীকেই মূল্য দিতে প্রস্তুত আছি। কাজ দিয়া কথার দাম, শুধু কথা দিয়া কথার আবার কিসের মূল্য? ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৪৪)

হরি-ওঁ

বারাণসী

বৃহস্পতিবার, ২৪ চৈত্র, ১৩৭২

৭।৪।৬৬

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

বৃদ্ধদের অনেক গুণ আছে, দোষেরও অন্ত নাই। তাঁহাদের অভিজ্ঞতা অনেক এবং ঠেকিয়া যাহা শিখিয়াছেন, অপরকে না ঠেকাইয়াই ইচ্ছা করিলে তাহা শিখাইতে পারেন। কিন্তু তাঁহারা সকলেই নিজেদের এই যোগ্যতার কথা স্মরণে রাখেন না। যোগ্যতার মানেই হইতেছে দায়িত্ব। যে যে বিষয়ে যোগ্য, সে তদনুরূপ কার্য্য করিতে বাধ্য। কিন্তু নিজেদের যোগ্যতা সম্পর্কে উপযুক্ত বিশ্বাসের অভাবহেতু অনেক বৃদ্ধেরাই দায়িত্ব পালন করেন না। আবার, যে বিষয়ে নিজের যোগ্যতা কিছুমাত্র নাই, সেই বিষয়ে নিজেকে যোগ্য বলিয়া ভ্রম করিয়া অনর্থক অধ্যবসায়ে প্রমত্ত হওয়া কোনও কোনও বৃদ্ধের স্বাভাবিক বিশেষত্ব।

বৃদ্ধেরা কেহ কেহ তোমাদের তরুণ প্রাণের আকৃতি ও আবেদন

উপলব্ধিতে আনিতে পারিলেন না বলিয়া যদি কোনও অন্যায় অধ্যবসায়ের দ্বারা তোমাদের ক্ষতি করিয়া থাকেন, তবে সম্প্রদায় হিসাবে বৃদ্ধদের প্রতি বিরক্ত হইয়া তোমরা লাভবান হইবে না। বৃদ্ধদের কাছ হইতে তাঁহাদের জীবনের অভিজ্ঞতাটুকু সংগ্রহ করিতে চেষ্টা কর কিন্তু নিজের যাত্রাপথের গতিবেগ হ্রস্বীভূত করিও না। আত্মবিশ্বাস লইয়া পথ চল।

ইহাই সদ্বুদ্ধি যে, এখন যুবকদের মধ্যে কাজ করিতে হইবে এবং সে কাজ এখনই আরম্ভ করিতে হইবে। অর্থনীতি, রাজনীতি এবং স্বাভাবিক যুক্তিবুদ্ধির গণ্ডীর সহিত সমস্ত সম্পর্ক ছেদন করিয়া কোনও কর্ম্মপন্থা গ্রহণ তোমাদের উচিত হইবে না। যে কাজ করিলে দেশের অর্থনৈতিক বিপর্য্যয় বাড়িবে, সে কাজে তোমরা হাত দিতে পার না। যে কাজে হাত দিলে দেশের রাজনৈতিক কুশলপ্রার্থী মহান্ কল্যাণ-কর্ম্মীদের কর্ম্মের পথে নূতন নূতন বাধা-বিঘ্ন বিপত্তির সৃষ্টি করা হইবে, এমন কাজও তোমরা করিতে পার না। যে কাজ স্বাভাবিক একটী মানুষের সহজ নীতিবোধ এবং সম্ভ্রম-বুদ্ধিকে আঘাত করে, তেমন কাজ তোমরা করিতে পার না। ধর্ম্মপ্রচারের নাম করিয়া দেশমধ্যে এমন অনেক কিছু প্রচারিত হইতেছে, যাহার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হইতেছে বুদ্ধিবৃত্তির বন্ধ্যাত্ব, মানুষের সহজ নীতিজ্ঞানের বিপর্য্যয়, চরিত্রোন্নত উর্দ্ধশীর্ষ স্থিতবক্ষ সৎসাহসী কর্ম্মী চমূর আবির্ভাবের বিঘ্ন এবং দেশ ও সমাজের মধ্যে নূতন নূতন অর্থনৈতিক দাসত্বের সঞ্জনন। এইরূপ ধর্ম্ম তোমরা প্রচার করিতে পার না। ধর্ম্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের অর্থ যেমন ধর্ম্মবিশেষের প্রতি বিদ্বেষী রাষ্ট্র নহে, তেমনি জানিও, রাজনীতি-নিরপেক্ষ ধর্ম্ম বা অর্থনীতি-নিরপেক্ষ ধর্ম্ম বলিতে

এমন ধর্ম্ম বোঝায় না, যাহা রাজনৈতিক সৎকর্ম্মীদের সততাপূর্ণ কর্ম্মের শত্রুতা এবং অর্থনৈতিক কর্ম্মীদের জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নতি সাধনের চেষ্টার প্রতি বিরুদ্ধ বা বিদ্বিষ্ট। ভিক্ষাবৃত্তিকে বা জোর করিয়া অর্থ আদায় রূপ দস্যুবৃত্তিকে যাঁহারা প্রশ্রয় দিতেছেন, তাঁহারা জাতীয় অর্থনীতির শত্রুতা সাধন করিতেছেন।

তোমাদের অগ্রগমনের পথ রাষ্ট্র, অর্থনীতি প্রভৃতি সম্পর্কে একেবারেই শত্রুতা-বোধ-বর্জ্জিত। রাজনৈতিক নেতারা ক্ষমতার লোভে অন্যায় পথে অর্থোপার্জ্জনকে প্রশস্য জ্ঞান করিয়াছেন এবং নিত্য নূতন হুকুম জারি করিয়া সর্ব্বসাধারণের আর্থিক দুর্গতিকে চূড়ান্ত দুঃখদ পরিণতির দিকে ঠেলিয়া লইয়া যাইতেছেন। ইঁহাদের অপকর্ম্ম প্রতিরোধের জন্য রাজনীতির চর্চ্চা তোমাদের পক্ষে অপরিহার্য্য হইবে, ইহা আমি মনে করি না। তোমরা দেশের দুইটী, দশটী, পাঁচটী, পঞ্চাশটী করিয়া যুবককে চরিত্রোন্নতির পথে পরিচালিত কর এবং অবিচলিত বিক্রমে ধৈর্য্যসহকারে সুদীর্ঘকাল ব্যাপিয়া এই একই কাজ করিয়া যাও। দেখিও, তোমাদের জীবৎকালেই নির্ব্বাক ইতিহাস বজ্রকণ্ঠে কথা কহিতে সুরু করিবে। নিজেদের প্রভুত্বকে চিরস্থায়ী রাখিবার বাসনায় যাহারা এই সেইদিনকার সত্য ইতিহাসকেও বিকৃত করিতেছে বা চাপিয়া রাখিতেছে, তোমরা যদি দেশমধ্যে কেবল চরিত্রবল-সম্পন্ন শত শত কিশোর-কিশোরীর সৃষ্টি করিতে পার, তাহা হইলে তাহাদের মিথ্যার বেসাতি দুইটী টোকায় উড়িয়া যাইবে, একটী ফুৎকারে বিনাশ পাইবে,—ঝড়ের আগমন প্রয়োজন হইবে না। যুবক-সমাজের ভিতরে তোমরা চরিত্রে বিপ্লব আনয়ন কর, যাহা ধর্ম্মে, সমাজে, রাজনীতিতে বা আর্থিক প্রয়াসে কোথাও এককণা মিথ্যাকে সহ্য করিবে না।

বৃদ্ধেরা নিজেদের নীচতার কাহিনী বাহিরে প্রচারিত হইলে ক্রুদ্ধ হইবে, অপরাধীরা রুষ্ট ও আক্রুষ্ট হইবে, ইহা অস্বাভাবিক নহে কিন্তু ক্রুদ্ধ না হইয়া যদি ইহারা লজ্জিত হইত, তবে ভাল হইত। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৪৫)

হরি-ওঁ

বারাণসী

শুক্রবার ২৫ চৈত্র, ১৩৭২

৮।৪।৬৬

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশীস নিও।

বংশগত গুরুর নিকটে দীক্ষা গ্রহণ করিতেই হইবে, এমন কোনও কথা নাই। তাঁহারা গুরু হইবার উপযুক্ত হইলে দীক্ষা নেওয়া যাইতে পারে। অনুপযুক্ত ব্যক্তি গুরুবংশে জন্মিলেই গুরু হইতে পারে না।

দীক্ষা গ্রহণের অর্থ হইতেছে, ঈশ্বরের নাম করিবার সঙ্কল্প গ্রহণ। দীক্ষা গ্রহণ করিলে সাধনাও করিতে হয়।

সমবেত উপাসনার সময় আমি উপস্থিত থাকি, ইহা সত্য। ভাগ্যবান্ ব্যক্তি হয়ত আমাকে চোখেও দেখিতে পারেন, ভক্তিমান ব্যক্তি অন্তরের উপলব্ধি দ্বারা তাহা বুঝিতে পারেন।

জগৎ একদিন হঠাৎ সৃষ্টি হইয়া গেল আর বিশ্বব্রহ্মাণ্ড একদিন হঠাৎ ধ্বংস হইয়া যাইবে, ইহা ভাবুক মনের কল্পনা মাত্র। সৃষ্টি অনাদি এবং বিলয়ও আদি-অন্তহীন। সৃষ্টি অনুক্ষণ চলিতেছে, লয়ও

সঙ্গে সঙ্গে হইতেছে, এই যে চঞ্চল প্রবাহ, তাহার মধ্যে যিনি অটল, অচল, সুস্থির তিনিই পরমেশ্বর।

যাহা করিলে চিত্তে তাপ আসে, তাহাই পাপ। ইন্দুর, আরসোলা, উঁইপোকা, ছারপোকা, মশা, মাছি, সাপ, বাঘ তোমার অনিষ্ট করিতে উদ্যত হইলে আত্মরক্ষার জন্য তুমি তাহাকে বধ করিতে পার। ইহাতে পাপ নাই, কেননা, ইহাতে তাপও নাই। আততায়ী শত্রু তোমাকে হত্যায় উদ্যত হইলে তাহাকে তুমি মারিতে পার। এই হত্যায় পাপ নাই। কিন্তু ধীমান পুরুষ তাহাকে হত্যা করেন না, যাহাকে হত্যা না করিলেও চলে। আহার্য্য গ্রহণের জন্য গাছ-পাতা কাটিয়া খাইতেছ, অথচ ইহাকে কেহ হিংসা বলে না। জীবন ধারণের জন্য মৎস্য, ছাগ, হংসাদি হনন করিলে লোকে বলে হিংসা হইল। জীবন যদি পরমেশ্বরের সেবার জন্য ধারণ করিতে হয়, তাহা হইলে শাক-পাতাই খাও বা মাছ-মাংসই খাও, তোমার পাপ নাই।

ভারতবর্ষের প্রচলিত বিশ্বাস এই যে, মানুষ মরিলে পুনরায় জন্মে। জন্মিলে সকলকেই মরিতে হয়, ইহা সমস্ত পৃথিবীতেই ঐতিহাসিক সত্য। মরিলে আবার জন্ম হইবে কি না, ইহা নিয়া ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মে ভিন্ন ভিন্ন রূপ বিশ্বাস দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা সত্য কি মিথ্যা, তাহা বিচার করিতে গিয়া সময় নষ্ট করা নিরর্থক। যাহার যাহা বিশ্বাস সে তদনুযায়ী চলুক। জন্মান্তরে বিশ্বাসী এবং পুনর্জ্জন্মে অবিশ্বাসী উভয়পক্ষীয় ধর্ম্মমতেরই সমস্বরে ইহাই উপদেশ যে, এখন যে কাজ করিতেছ, তাহা সদ্ভাবে কর, সদ্বুদ্ধিতে কর, সদুদ্দেশ্যে কর, সদুপায়ে কর। কোনও কোনও ধর্ম্মের অবলম্বনকারীরা উপায়ের সততাকে ততটা আবশ্যকীয় মনে করেন না, লক্ষ্যটী সৎ হইলেই যথেষ্ট হইল বলিয়া তাঁহারা মনে করেন। কিন্তু এইরূপ মতবাদ আত্মপ্রবঞ্চনা সৃষ্টি করে বলিয়া গর্হিত।

জন্মান্তরে বিশ্বাস আসে, বিশ্বাস কর এবং সৎভাবে জীবন চালাও। পুনর্জ্জন্মবাদে ভক্তি না আসে ত' বর্জ্জন কর কিন্তু বর্ত্তমান জীবনটী সুন্দররূপে পরিচালন কর। সদ্ভাবে জীবনযাপন একজনের পক্ষে পুনর্জ্জন্মে বিশ্বাস করার দরুণ প্রয়োজন, অপরের পক্ষে বিশ্বাস না করার দরুণই প্রয়োজন। সৎ জীবনযাপন যখন উভয়ের পক্ষেই প্রয়োজন, তখন বিশ্বাস আর অবিশ্বাস লইয়া দ্বন্দ্বযুদ্ধে নামিয়া লাভ কি? বস্তুতঃ কর্ম্মফল উভয়েই মানিতেছে।

যাহারা বলে, কর্ম্মফল মানি না এবং ঋণ করিয়া ঘি খাইব, দেনা শোধ করিব না, প্রকৃত প্রস্তাবে তাহারা মনে মুখে এক নহে। পুনর্জ্জন্ম নাই বলিয়া মস্ত ভরসা পাইয়াছ যে, পরের জন্মে দেনা শোধ করিতে হইবে না কিন্তু এই জন্মে যে দেনা শোধ না করিবার দরুণ হাটে-মাঠে চড়-চাপড় খাইতে হইবে, তাহার হাত এড়াইবে কি করিয়া? কর্ম্মফল সকলেই মানে। সুতরাং বিরোধের সীমানা সঙ্কুচিত হইয়া গেল। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৪৬)

হরি-ওঁ

কলিকাতা

সোমবার ২৮ চৈত্র, ১৩৭২

১১-৪-৬৬

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

সঙ্ঘের সম্মান অটুট রাখিতে হইলে সঙ্ঘানুবর্ত্তী প্রতিটি নরনারীর ব্যক্তিগত জীবনকে অকলঙ্ক রাখিতে হইবে। গোড়ার এই বড় কথাটা তোমরা চট্ করিয়া ভুলিয়া যাইও না।

পরের মেয়ের দিকে কুদৃষ্টি যাহারা দেয়, তাহারা কোনও সঙ্ঘ বা সমাজের গৌরব নহে, তাহারা সঙ্ঘের রৌরব, সমাজের কুম্ভীপাক। পরের ট্যাঁকের দিকে যাহাদের লুব্ধ লক্ষ্য, তাহারাও কোনও সঙ্ঘ বা সমাজের সম্পদ নহে, তাহারা জঞ্জাল ও আপদ।

একটী মেয়ে স্বামী পরিত্যক্তা, কিন্তু তাহার একটী স্বামীর প্রয়োজন। এই স্থলে এই মেয়েটীকে কেহ পরকল্যাণ বুদ্ধিতে বিবাহ করিলে অন্যায় কাজ হয় না। এইরূপ বিবাহ রেজেষ্টারী করিয়া হওয়াই ভাল। কারণ, এই সকল বিবাহে আইনের অনেক ব্যাসকূট রহিয়াছে। আজ যে পাষণ্ড দশ বৎসর ধরিয়া পত্নীকে পরিত্যাগ করিয়া দূরে সরিয়া আছে এবং এমন কি আর একটী পত্নী গ্রহণ করিয়া সুখে আছে, সে যেই মুহূর্ত্তে শুনিল যে, তাহার পরিত্যক্তা পত্নী পত্যন্তর গ্রহণ করিয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে তাহার সুপ্ত স্বামীত্ব হঠাৎ জাগিয়া উঠে এবং পাগলা সিংহের মত গর্জ্জন করিয়া সে পরিত্যক্তা অভাগিনীর নূতন আশ্রয়-নীড়টুকুকে নষ্ট করিয়া দিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়া যায়। সত্যিকারের কোনও দাবীর ভাব ইহার ভিতরে নাই। কেননা, প্রদেয় বস্তুর সহিত সংশ্রবহীন কোনও দাবী জগতে বৈধ নয়। যে কাহারও কাছে কিছু দাবী করিবে, তাহাকে বিনিময়ে কিছু দিতেও হইবে। নিজে স্বামীর অধিকার দাবী করিলে স্ত্রীকেও স্ত্রীর অধিকার দিতে হইবে। যেই পাষণ্ড স্ত্রীকে অনায়াসে পরিত্যাগ

করিয়াছে, সে স্ত্রীকে তার অধিকার ফিরাইয়া দিতে কিছুতেই যে সম্মত হইবে না, ইহা একটা সাধারণ বুদ্ধির কথা। তবু সে যে যাঁড়ের লড়াই লড়িতে ছুটিবে আইন-আদালতে, তার একমাত্র উদ্দেশ্য নিজের নাক কাটিয়া হইলেও পরের যাত্রা ভঙ্গ করা।

এই সকল ক্ষেত্রে আমি অখণ্ড-মতে বিবাহ অনুমোদন করি না। এই সকল বিবাহ অন্য মতে হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

তুমি যেই বিবাহ-প্রস্তাবটী তুলিয়াছ, তার চেয়েও বিপজ্জনক ব্যাপার তোমাদের মধ্যে রহিয়াছে। এক গুরুভাই অন্য গুরুভাইকে ছল-চাতুরী করিয়া টাকা-পয়সায় ঠকাইতেছে, এই সব দৃষ্টান্ত কি খুব গর্ব্বের? এগুলি কি তোমাদের নৈতিক সবলতার প্রমাণ? এই জাতীয় ঘটনার দ্বারা তোমরা কি তোমাদের সঙ্ঘে মর্য্যাদা বাড়াইবে? আর্থিক ব্যাপারে পৃথিবীর যে কোনও লোকের সঙ্গে তোমাদের সততা আদর্শস্থানীয় হওয়া উচিত। দুর্ভাগ্যক্রমে তাহার বিপরীত দৃষ্টান্ত প্রায় সকল স্থানেই দুই একটা করিয়া দেখিতে পাইতেছি। অসদুপায়ে অর্থার্জ্জন যে কতবড় জঘন্য পাপ, এই কথা তোমরা কেন নিয়ত স্মরণ রাখিবে না? বরং চিরদারিদ্র্যে ভুগিয়া মর তথাপি পাপার্জ্জিত অর্থের দিকে লুব্ধ দৃষ্টি দিও না। জগতে সাধারণ ব্যক্তিদের সঙ্গেই তোমাদের এই বিষয়ে তীক্ষ্ণ সতর্কতা রাখিয়া চলা উচিত। কিন্তু গুরুভাই ভগিনীদের সম্পর্কে এতদ্বিষয়ে তোমাদের মনোযোগ তীক্ষ্ণতর এবং চেষ্টা তীব্রতর হওয়া প্রয়োজন। টাকাকড়ির ব্যাপারে গুরুভাই-বোনদের মধ্যে পারস্পরিক অবিশ্বাসের হেতু সৃষ্টি হইবে, কোনও একটা সদাচারী সংঘের পক্ষে এর চাইতে গুরুতর ব্যাপার আর কিছু নাই। এই বিষয়ে তোমরা

প্রত্যেকে যদি সতর্ক না হও এবং সকলকে যদি সতর্ক না কর, তাহা হইলে আমি সংঘের ভবিষ্যৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন দেখিতেছি।

এক গুরুভাই অপর গুরুভাই বা ভগিনীকে ঠকাইতে রুচিগ্রস্ত হওয়ার ফলে তোমাদের আধ্যাত্মিক অবনতিও দ্রুততালে ঘনাইয়া আসিবে। বৈষয়িক এবং আধ্যাত্মিক উভয় উন্নতিকেই সমতালে চালাইয়া নেওয়া তোমাদের দায়িত্ব। এক দিকে চুরি-চামারি করিয়া ধনার্জ্জন করিবে, অন্যদিকে হরিনাম কীর্ত্তন করিয়া পাপ-খণ্ডন করিবে, এই জাতীয় পাটোয়ারী বুদ্ধি তোমাদের যেন না থাকে। পাপমুক্ত জীবন যাপন করিয়া তাপমুক্ত নামকীর্ত্তন করিবে, ইহাই তোমাদের লক্ষ্য হউক।

আমার হিপ্‌জয়েন্টের দারুণ ব্যথা লইয়া ৫ এপ্রিল ধানবাদ হইতে বেনারস পৌঁছিয়াছি। ৯ এপ্রিল রাত দেড়টায় পাঠানকোট ধরিয়া ১০ এপ্রিল ধানবাদ পৌঁছিয়াছি বেলা এগারটায়। সেদিন চারিটায় ট্রেইণ ধরিয়া রাত এগারটায় কলিকাতা পৌঁছিয়াছি। আজ দিনটুকুই কলিকাতা থাকিয়া কাল সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে রওয়ানা হইব ধানবাদ। শরীরে একটা দারুণ যন্ত্রণা লইয়া এই ভাবে আমি কষ্টকর শ্রম করিতেছি তোমাদেরই জন্য। আর তোমরাই যদি নানাবিধ অসৎকীর্ত্তি করিয়া সংঘকে কলঙ্কিত কর, তবে আর এর চাইতে বড় দুঃখ কি হইতে পারে? ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৪৭)

হরি-ওঁ

শিলিগুড়ি
শনিবার, ১৬ই বৈশাখ, ১৩৭৩
৩০-৪-৬৬ ইং

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

হোজাই হইতে গৌহাটী, মাল, কার্শিয়ং, দার্জ্জিলিং হইয়া কাল রাত্রি দশটায় শিলিগুড়ি পৌঁছিয়াছি। আজই সকালে জলপাইগুড়ি যাইবার কথা ছিল কিন্তু আজ আর যাওয়া হইবে না। শিলিগুড়ির উপাসনা কাল সারিয়া পরশু যাইব মালদহ, তার পরের দিন কলিকাতা। ভিড়ে এবং ব্যস্ততায় লেখনী ধরিতে পারি নাই, এর মধ্যে কয়েক গণ্ডা গান আসিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া ফিরিয়া গেল। তাহাদের দিকে তাকাইতে পারি নাই। জীবন ভরিয়া যদি গানই লিখিতাম আর গানই গাহিতাম, তবে তাহা কিছু আশ্চর্য্যজনক ব্যাপার হইত না। অন্যের ভাল না লাগুক, আমি আনন্দে থাকিতাম। কিন্তু দিনের পর দিন কেবল কাজ আর কাজ করিয়া যাইতেছি। এ কাজে কত শ্রম, কত আয়ুঃক্ষয়, এই ধারণাটুকু তোমাদের নাই বলিয়াই কাজের উপরে নূতন কাজ ও তাহার দায়িত্ব আমার স্কন্ধেই অর্পণ করিয়া যাইতেছ। তোমাদের যে কাজ করা প্রয়োজন, তাহা ভাবিতেছ কোথায়? এইখানেই ত' আমার সৈনাপত্যের সব চেয়ে বড় বিফলতা। আমাকে নেতা বলিয়া মানিলে কিন্তু আমার উপদেশ, নির্দ্দেশ, আদেশ—এর একটাও পালন করিতে তোমাদের প্রাণ ব্যাকুল হইল না। হৈচৈ করিয়া আড়ম্বর করিয়া দশ হাজার লোককে ডাকিয়া আনিয়া মহোৎসবের খিচুড়ী

খাওয়ানো ছাড়া আর অন্য দিকে তোমাদের মন ধাবিত হইল না। তোমাদের এই যে জড় মনোভাব, ইহাকে লইয়া তোমরা কি করিবে?

হোজাইতে ছেলেমেয়েরা আমার ·কাছে আসিয়া মাথা-কপাল খুঁড়িয়াছে, যেন আমি বিশ্বম্ভর মূর্ত্তিতে এক খিচুড়ীর মহোৎসবের মহৎ দৃশ্য উদ্‌ঘাটন করিতে তাহাদিগকে অনুমতি দেই। এই খেচরান্ন-পর্ব্বটী না হইলে নাকি লজ্জার অবধি থাকিবে না। একথার আমি অর্থ বুঝিতে পারি নাই। সারা ভারতের নানা প্রান্ত হইতে ছয় সাত হাজার প্রতিনিধি হোজাই সমবেত হইয়াছেন একটা বিশেষ উদ্দেশ্য লইয়া। সেই উদ্দেশ্যটী যাহাতে নিখুঁত রূপে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ভাবে সাধিত হয়, ইহাই সকলের আগের কথা। একাজটী সম্পাদনের জন্য হোজাই অখণ্ডমণ্ডলীর প্রত্যেকে যে যথেষ্ট শ্রম করিয়াছেন, একথা যথার্থ। কিন্তু এই অনুষ্ঠানের আসল উদ্দেশ্য হইতেছে কতকগুলি স্থায়ী ব্যাপারের পদ্ধতি নির্ণয়, অস্থায়ী একটী একদিনের খেচরান্ন মহোৎসবের প্রসঙ্গ এস্থলে নিতান্ত গৌণ। এই গৌণ ব্যাপারকে এত প্রধান বলিয়া ভাবিতে ইহারা কেন চাহিল, ইহা চিন্তা করিয়া দেখা কর্ত্তব্য। জীবন ভরিয়া ত' কত খেচরান্ন-প্রসাদ-বিতরণ প্রত্যক্ষ করিলাম কিন্তু কোন্ মহোৎসবের পরে কোথায় কোন্ স্থায়ী কল্যাণের প্রতিষ্ঠা ঘটিয়াছে, ইহা খুঁজিয়া দেখিবার কি আজও প্রয়োজন ঘটে নাই? মহোৎসবের প্রসাদের একটা অতীব সাত্ত্বিক আকর্ষণ আছে, যাহা এমন লোককেও প্রসাদ-গ্রহণকারীদের পংক্তিতে নিজ মহিমায় বসাইয়া দেয়, যাহারা নিমন্ত্রিত হইলেও হয়ত তোমার গৃহে পাত পাড়িবেন না। মহোৎসবের প্রসাদের এই মহনীয়ত্ব স্বীকার করিয়া লইয়াও একথা মনে রাখিতে হইবে যে, আমরা যে এক এক স্থানে দলে দলে মিলিত হই, তাহা

দেশ, সমাজ, জাতি ও জগতের কোনও স্থায়ী কল্যাণ সাধনের উদ্দেশ্যে,—ইহার লক্ষ্য কদাচ সাময়িক নহে।

হোজাইতে আসিয়া তোমরা নানা প্রয়োজনীয় বিষয়ে অকুণ্ঠিত চিত্তে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করিয়াছ। রাত্রি তিনটা পর্য্যন্ত সভার অধিবেশন চলা একটা তুচ্ছ কথা নহে। এখন প্রয়োজন হইতেছে তোমাদের কিঞ্চিৎ স্মৃতিশক্তির চর্চ্চা করা। কি তোমরা সেখানে বলিয়াছ, ভাবিয়াছ, সঙ্কল্প করিয়াছ, তাহা বারংবার তোমাদের স্মরণ করিতে হইবে। নতুবা, যাহা এক কাণে শুনিয়াছ, তাহা অন্য কাণ দিয়া বাহির হইয়া যাইবে। যে-যাহা শুনিয়া আসিয়াছ, সে তাহা অপর সকলকে শুনাও। ইহা তোমাদের সুমহৎ কর্ত্তব্য। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৪৮)

হরি-ওঁ

শিলিগুড়ি
১৬ বৈশাখ, শনিবার, ১৩৭৩
৩০।৪।৬৬

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

তোমরা কেহ কেহ হোজাই মহাসম্মেলনে যোগদান করিতে ঘরের শত কাজ ফেলিয়াও গিয়াছিলে দেখিয়া বড়ই আহ্লাদিত হইয়াছি। বছরে দু-বছরে দুই চারিটা দিন সকলে কাজকর্ম্ম ফেলিয়া রাখিয়া একেবারে নিশ্চিন্ত নিরুদ্বেগ বৈরাগী হইয়া সকলে গিয়া ছুটিয়া একটী

স্থানে উপস্থিত হইলে এবং সংসার-জীবনের সহস্র সমস্যার উর্দ্ধে অবস্থিত কোনও সুমহৎ সত্যে প্রত্যেকে প্রত্যেকের সহিত আত্মার আত্মীয়তা স্থাপন করিয়া সুমহতী প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করিয়া গৃহে ফিরিলে, —ইহা এক অনির্ব্বচনীয় আনন্দের উৎস-মুখ উদ্‌ঘাটন, জানিও। অতীতে রহিমপুরে এবং ডিব্রুগড়ে একাজ তোমরা করিয়াছ। ঐ ঐ স্থানের নিজ নিজ বিশেষত্ব চিরস্মরণীয় রহিবে কিন্তু হোজাইতে তোমরা সংগঠনী শক্তির মহত্তর অনুশীলন করিয়াছে। ডিব্রুগড় বা আগরতলার কর্ম্মাধ্যক্ষেরা যত বড় ধন-ভাণ্ডার হাতে পাইয়াছিলেন, হোজাইয়ের কর্ম্মাধ্যক্ষেরা তাহার সিকিও হাতে পান নাই। তথাপি এখানে প্রায় সকল দিক দিয়া সুব্যবস্থা অনিন্দ্য হইয়াছিল। দেখিয়া নানা বিষয় শিখিবার প্রয়োজন আছে। তোমাদের অঞ্চল হইতে যাহারা হোজাই গিয়াছিল, তাহারা নিশ্চয়ই এসব দেখিয়া নিজেদের অনেক বিষয়ের পূর্ব্বধারণাকে স্পষ্টতর করিতে সমর্থ হইয়াছে।

যাহারা যায় নাই, তাহারা ভুল করিয়াছে। তোমাদের অঞ্চল হইতে হোজাই দূর নহে। যদি মহারাষ্ট্রের অম্বরনাথ হইতে, মধ্য প্রদেশের বিলাসপুর হইতে, উত্তর প্রদেশের দেরাদূন হইতে ছেলেরা হোজাই আসিতে পারে, তাহা হইলে কাটিহার, রায়গঞ্জ, শিলিগুড়ি, মাল প্রভৃতি স্থান হইতে প্রতিনিধিদের না যাইতে পারা ক্ষমার্হ নহে। ত্রিপুরা রাজ্যের দুর্গম স্থান হইতে কত কত ছেলেমেয়ে হোজাই আসিয়াছে, যেখান হইতে আসিবার যান-বাহন নিতান্তই স্বল্প এবং বিপজ্জনক, আর কাটিহার হইতে আলিপুরদুয়ার পর্য্যন্ত স্থানটুকুর রেলষ্টেশনের সংলগ্ন অনেকগুলি

মণ্ডলীর একটী কাক-প্রাণীও আসিল না, কোনও কোনও স্থান হইতে নাম মাত্র আসিল, ইহা আমার মতে ক্ষমার্হ নহে। ভাড়ার টাকার অসুবিধা হইলে মণ্ডলীর দশ জনে মিলিয়া টাকা তুলিয়া একটী কি দুইটী বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিকে প্রেরণ করিতে পারে, যাহার বা যাহাদের পক্ষে সমস্ত আলোচনা এবং প্রত্যালোচনার সারাংশ মস্তিষ্কে করিয়া বহন করিয়া আনিয়া নিজ নিজ অঞ্চলের ভ্রাতা-ভগিনীদের মধ্যে পরিবেশন সম্ভব। সামান্য সংঘশক্তির চর্চ্চা থাকিলে একাজটুকু অতি সহজেই হইতে পারে। মুখে মুখে স্থানে স্থানে মণ্ডলী স্থাপিত হইতেছে কিন্তু সংঘশক্তির চর্চ্চা হয় নাই। ফলে একজন বংশীধর মহাসম্মেলনেও যাইতে পারিল না ঘরের কাজের দরুণ, একজন মধুসূদন পারিল না ছেলের অসুখের দরুণ, একজন চিত্তরঞ্জন যাইতে পারিল না শুধু টাকার অভাবের দরুণ। বংশীধর আর মধুসূদনের দল জন-পিছে একটী করিয়া টাকা স্বতঃপ্রবৃত্ত ভাবে দিলে চিত্তরঞ্জনরা যাইতে পারিত এবং কি দেখিল, কি শুনিল সব আসিয়া নিজ স্থানে বর্ণন করিতে পারিত। রেল-লাইনের সংলগ্ন অনেক মণ্ডলীরই বড় সাধ যে, আমি নিজের অসুবিধা করিয়া হইলেও এই এই স্থানে যেন একটী করিয়া ভ্রমণ-তালিকা করি। কিন্তু যেই মহাসম্মেলনের আলোচনার অংশভাক্ আমি প্রত্যেক স্থানের মণ্ডলীকে এবং প্রধান প্রধান অখণ্ডদিগকে হইতে দেখিতে চাহি, নিজেদের অসুবিধা করিয়া সেই মহা-সম্মেলনে এই কয়টী স্থানের একটী কাকপ্রাণীও গেল না, ইহা কি ভালকাজ হইল? যাহারা ফেণীর উৎসবে গিয়াছ, তাহারা প্রত্যক্ষ করিয়াছ যে, প্রথাগত

ব্রাহ্মণ্যের বিপুল বিরুদ্ধতার মুখে কেমন করিয়া একটী পোদ্দার-পরিবারের স্বার্থ-ত্যাগে ওঙ্কার-মহানামের বিজয়-পতাকা উড়িতে পারে। যাহারা রহিমপুরের উৎসবে গিয়াছে, তাহারা দেখিয়াছে, সহস্র সহস্র অজানা অচেনা চির-অপরিচিত ভক্তদের স্বেচ্ছাবৃত ত্যাগে কি করিয়া এক মহীয়ান অনুষ্ঠান হইতে পারে। তবে, সেটি ছিল দেড় দিন কি আড়াই দিনের ব্যাপার। ডিব্রুগড়ের অনুষ্ঠানে যাহারা গিয়াছে, দেখিয়াছে, তিন চারি দিন ধরিয়া অসংখ্য জনসমাগমে কি করিয়া সুশৃঙ্খল ভাবে কাজ করা যায়। আগরতলার অনুষ্ঠানে যাহারা গিয়াছিল, তাহারা অধিকাংশই অব্যবস্থা-জনিত চূড়ান্ত ক্লেশে ভুগিয়া ঘরে ফিরিয়াছে কিন্তু প্রাণের কি পরিমাণ ব্যাকুলতা থাকিলে রাষ্ট্রীয় সীমান্তের দুয়ার অক্লেশে খুলিয়া যায়, দিল্লী বা পিণ্ডির হুকুমের প্রয়োজন হয় না, তাহা প্রত্যক্ষ করিয়া আসিয়াছে। এবার হোজাই গেলে ইহারা প্রত্যেকে দেখিয়া আসিত, অতি অল্প পরিমাণ আর্থিক সম্বল হাতে লইয়া কেমন করিয়া অতীব সুশৃঙ্খল ভাবে সাড়ে চার বা পাঁচ দিন ধরিয়া অনুষ্ঠান-পরিচালকেরা প্রশংসনীয় যোগ্যতার সহিত কাজ করিয়া গিয়াছেন। রহিমপুরে সাত শত স্বেচ্ছাসেবক পঁয়ত্রিশ হাজার নরনারীর সেবায় যে যোগ্যতার সহিত কাজ করিয়াছিল, হোজাইতে দেড় দুই শত স্বেচ্ছাসেবক ছয় সাত হাজার নরনারীর সেবায় সেই যোগ্যতার প্রায় কাছাকাছি পৌছিয়াছে বলিয়া দাবী করিতে পারে। অবশ্য রহিমপুরের বিরাট ব্যাপকতা হোজাইতে কল্পনা করা যায় না।

এমন ব্যাপার যে-সকল মণ্ডলীর একটী সভ্যও চোখে দেখিল

না, তাহারা এই অবহেলা হইতে কি লাভ লভিল বলিতে পার? দেখিয়া যাহারা শিখে, তাহারা বুদ্ধিমান। সুযোগ থাকিতেও যাহারা শিখিতে চাহে না, তাহাদিগকে কোন্ সংজ্ঞা দিব?

তোমরা যে কয়জন যাহা দেখিয়াছ, যাহা শুনিয়াছ, তাহা চারিদিকে প্রচার কর। এক্ষেত্রে প্রচারের গুরুতর আবশ্যকতা আছে। তোমরা যদি স্থানে স্থানে গিয়া সকল বিষয় ব্যাখ্যা করিয়া অন্যান্যদিগকে বুঝাইয়া না দাও, তাহা হইলে তোমাদের ললাটের চন্দন-লেখা হইতে ত' কেহ অনুমান করিতে পারিবে না যে, তোমরা হোজাইতে কি ঘোড়ার ঘাস কাটিতে গিয়াছিলে না চন্দনতরুর সুপুষ্ট শাখা আহরণ করিয়া আনিয়াছ। তোমাদের মুখ হইতে সকল কথা শুনিয়া প্রত্যেক শ্রোতার মনে বিপুল শ্রদ্ধার উদয় হউক। শ্রদ্ধা ছাড়া কোনও কাজের ভিত্তি পাকা হয় না। তোমরা যাহা যাহা শুনিয়া বা বলিয়া আসিয়াছ এবং যাহা অধিকাংশ বোদ্ধার মনে সমর্থন জাগাইয়াছে, তাহা সকলের কাছে বারংবার বলিয়া বলিয়া তোমাদের নিজেদের সঙ্কল্পকে দৃঢ়তর করিতে থাক। কথা বলাটাও একটা কাজ কিন্তু সত্য সত্য স্থায়ী কাজ করিবার জন্য যে কথা, সেই কথাই প্রশস্য।

আজ হইতে তোমরা নিজ নিজ ব্যক্তিগত সাধনায় এবং সাপ্তাহিক সমবেত উপাসনায় পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর নিষ্ঠাশীল হও। সাধনবলে বলীয়ান্ কর্ম্মীরাই যে-কোনও কাজ দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া সম-পরাক্রমে চালাইয়া যাইতে পারে। এই কথাটী মনে প্রাণে বিশ্বাস করিও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৪৯)

হরি ওঁ

শিলিগুড়ি
১৬ই বৈশাখ, ১৩৭৩

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

ত্রিপুরার দুর্গম অঞ্চল হইতে হোজাই গিয়াছিলে। গিয়াছিলে শুধু শুনিবার জন্য যে, কে কি বলে, কোন্ নূতন পথনির্দ্দেশ পাওয়া যায়। অনেক কিছু শুনিয়াও আসিয়াছ। সেইগুলি নিয়া বারংবার মনে মনে আলোচনা ও পর্য্যালোচনা করিতে থাক। ভাল ভাল কথা যাহা শুনিয়াছ, তাহা কাজে পরিণত করিবার জন্য ঐ কথাগুলি মনে মনে মুখে মুখে বারংবার আবৃত্তি কর এবং পুনঃ পুনঃ শত শত জনকে শোনাও। নিজের কথা নিজে শুনিতে শুনিতে এবং অপর সকলকে শুনাইতে শুনাইতে নিজের ভিতরে যখন কাজ করিবার জন্য দিব্য উন্মাদনা জাগিবে, জানিও, তখন তুমি কাজ সুরু করিবার উপযুক্ত হইয়াছ। একেবারে পাগল না হইয়া গেলে কি কেহ একমনে একপ্রাণে কাজ করিতে পারে?

কিন্তু একটী কথা মনে রাখিও। কথা কহিতে কহিতে যখন কথাই শুধু বাড়িবে, দিব্য উন্মাদনার সৃষ্টি হইবে না, তখন কথা ছাড়িতে হইবে। তখন অবলম্বনীয় হইবে মৌনভাবে নিরন্তর ধ্যান। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৫০)

হরি ওঁ

শিলিগুড়ি

রবিবার, ১৭ই বৈশাখ, ১৩৭৩

১-৫-৬৬

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তোমরা সাত আট জন দশধা হইতে হোজাই আসিয়াছিলে দেখিয়া কি যে আনন্দিত হইয়াছি, বলিবার নহে। লামডিং-এ ট্রেণে বোমা বিস্ফোরণে তোমরা কেহ নিহত হও নাই, ইহা এক আশ্চর্য্য ব্যাপার। কিন্তু তোমাদের সঙ্গী শশীমোহন কোমরে চোট্ পাইয়া এখনও নাকি হাসপাতালে। সে কেমন আছে, জানিবার জন্য বড়ই উদ্বিগ্ন রহিলাম। দ্রুত কলিকাতা ঠিকানায় তাহার কুশল সংবাদ জানাও। আশীর্ব্বাদ করি, শশীমোহন দীর্ঘায়ু হউক।

ঐ ট্রেণে হোজাই-নিবাসী আরও দুইটী যুবক বোমার টুকরায় বিশেষ ভাবে আহত হইয়াছিল। তাহাদিগকে আমি তাহাদের বাড়ী গিয়া দেখিয়া আসিয়াছি। মরিয়া গেলে কে আটকাইতে পারিত? দুদিন পরে শনিবারে আবার ডিফু ষ্টেশনে ট্রেণে বোমা ফাটিল। তিন চারি শতাধিক প্রাণপ্রিয় অখণ্ড সন্তানেরা ঐ ট্রেণে আপার আসাম হইতে আসিতেছিল। ১০ বৈশাখ, রবিবার বেলা ৯টা পর্য্যন্ত ইহাদের কোনও খবর আমরা পাইতেছিলাম না। সম্মেলন আরম্ভ হইবার সামান্য পরে ইহারা সকলে সম্মেলনস্থানে আসিয়া পড়ায় সকলে যেন আহ্লাদে আটখানা হইয়া গেল কিন্তু হায়, যাহারা মরিল, তাহাদের

জন্য অন্তরে আমাদের যে বেদনা, তাহা দূর করিব কি করিয়া? এই দুই দিনের বোমা-বিস্ফোরণে যাহারা মরিল, তাহাদের মধ্যে আমার শিষ্য-শিষ্যা বা তোমাদের গুরুভাই-গুরুবোন্ কেহ নাই কিন্তু ইহারা কি এই দেশেরই মানুষ নহে? ইহাদের ক্ষতি কি আমাদেরই ক্ষতি নহে? ইহাদের মৃত্যু কি আমাদেরই শোক নহে? ষ্টেশনে তারের খাম্বাগুলিতে যে সকল মাংসের ডেলা ঝুলিয়া রহিয়াছে, ইতস্ততঃ যে সকল হস্তাঙ্গুলী, পদাঙ্গুলী, পাকস্থলী বা বিকৃত মুণ্ডগুলি ছড়াইয়া রহিয়াছে, অসহনীয় দুর্গন্ধ বিস্তার করিয়া অজানা অচেনা লোকগুলির শরীরের নানা অঙ্গপ্রত্যঙ্গ যেভাবে এখানে সেখানে লাগিয়া রহিয়াছে, তাহা হইতে আমরা কেহই বুঝিয়া উঠিতে পারিব না যে, কাহারা গেল, কোন্ কুসুমগুলি অকালে ঝরিল আর এমন নৃশংস ভাবে ঝরিল। কিন্তু ইহাদের কি জীবনের কোনও মূল্য নাই? ইহাদের জীবনের মূল্য দাবী করিবার কি আমাদের অধিকার নাই? দেশের নেতৃত্ব হাতে লইয়া নিজেদের অযোগ্যতা, মানসিক দুর্ব্বলতা এবং কর্ত্তব্যে অবহেলার দ্বারা যাহারা এতগুলি লোকের পরপর দুই দিনে দুইটী দুর্ঘটনার মৃত্যু-দৃশ্য অবহেলে দেখিল, তাহাদের সম্পর্কে উপযুক্ত দণ্ড-বিধানের সামর্থ্য আমাদের হাতে না থাকিতে পারে কিন্তু যাহারা চিরতরে জগতের চিত্রপট হইতে এমন ভাবে মুছিয়া গেল যে, কে যে ছিল আর কে যে ছিল না, তাহা বুঝিবার, জানিবার, বলিবার, উপায়টুকু মাত্র রহিল না, সেই দুর্ভাগ্য নরনারীদের জন্য আমরা দুই ফোঁটা শোকাশ্রুও কি ফেলিব না? এই শোকাশ্রু উৎপীড়নের প্রশ্রয়দাতাদের পক্ষে যথেষ্ট ধিক্কার বলিয়া বিবেচিত না হইতে পারে কিন্তু আমাদের অন্তরের বেদনাকে আংশিক হইলেও ত' লঘু করিয়া

দিবে!

আমি আরও ভাবিতেছি। যে নরনারীগুলি ঐ দুইদিন নাগাদের বোমায় স্বাধীন ভারতের রেলপথে চলিতে গিয়া ধরাপৃষ্ঠ হইতে নিশ্চিহ্ন হইয়া গেল, তাহাদের যে যেখানে আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, পত্নী-স্বামী, পিতা-মাতা, ভ্রাতা-ভগিনী আছে, কে কবে জানিবে যে, ইহাদের পরিণতি কি হইয়াছিল? যুদ্ধক্ষেত্রে সৈনিকেরা মরে, তাদেরও আত্মীয়েরা মৃত্যুর সংবাদটা জানিতে পারে এবং মৃত্যু মানুষমাত্রেরই পক্ষে অবশ্যম্ভাবী ভাবিয়া দুই দিন কাঁদিয়া কাটিয়া শেষে দার্শনিক চিন্তা দ্বারা সান্ত্বনা খুঁজিয়া পায়। কিন্তু ইহাদের আত্মীয়েরা এই বিষম বিয়োগের সংবাদ জানিল না, চিরপ্রতীক্ষায় ইহারা দিন কাটাইবে, কোনও পল্লীকুটীরে প্রেষিত-ভর্ত্তৃকা নারী প্রতি রজনীতে জীবন ভরিয়া প্রদীপ জ্বালিয়া প্রতীক্ষা করিবে স্বামীর, কোনও বালক বা বালিকা বিদেশগত পিতার প্রতীক্ষায় প্রতিক্ষণ দিন গণিবে, কোনও অনাথা বিধবা তাহার অন্ধ-নয়নের একমাত্র নীলমণি উপযুক্ত পুত্রটীর প্রতীক্ষায় পুত্রবধূর স্কন্ধে হাত দিয়া উৎকণ্ঠিত চিত্তে দিবানিশি কাটাইবে,—কিন্তু হায়, মৃত্যু আসিয়া শিয়রে দাঁড়াইয়া যখন বলিবে, "চল, তোমাকে নিতে আসিয়াছি", তখনও সে আর আসিবে না, যাহাকে একটীবার না দেখিতে পাইলে তাহার এতকালের প্রতীক্ষা মিথ্যা, মৃত্যুও মিথ্যা। —ইহাদের কথা আমি ভাবিতেছি।

সোমবার ২৫শে এপ্রিল ১১ বৈশাখ সায়ংকালে প্রায় দশ হাজার শ্রোতা লইয়া হোজাইতে ডাঃ বড়ুয়ার সভাপতিত্বে যে জনসভা হয়, সেই সভায় আমরা প্রথমেই লামডিং ও ডিফুতে নিহত ব্যক্তিদের আত্মার শান্তির জন্য ভগবচ্চরণে প্রার্থনা করিয়াছিলাম। কিন্তু এই

সকল হতভাগ্য নিহতদের আত্মীয়দের জন্য আমরা কি করিতে পারিয়াছি? ইহার পরে এই জাতীয় দুর্ঘটনা যদি আরও ঘটে, তাহা হইলে তখন যাহারা নিহত হইবে, তাহাদের আত্মীয়-স্বজনদের জন্যই বা কি করিতে পারিব? আজ মানুষের জীবনের কোনও মূল্যই নাই, মূল্য শুধু দলগত রাজনীতির। দলগত রাজনীতি অপদার্থগুলিকে সিংহাসনে বসাইবার ক্ষমতা রাখে কিন্তু দেশের মানুষের দুঃখ-বিদূরণের বা বিপত্তি সম্ভাবনা হ্রাসের যোগ্যতা রাখে না। দলকে ভালবাসা যে আজ দেশকে ভালবাসার চেয়ে বড় ধর্ম্ম বলিয়া গৃহীত হইয়াছে, ইহা দেশের পরম দুর্ভাগ্য।

দশধাতেও তোমরা নিশ্চিন্ত নহ। মিজোরা ঐ সীমান্তে দারুণ অশান্তির সৃষ্টি করিয়াছে। পূর্ব্ববঙ্গ হইতে জন্মভূমি ছাড়িয়া বিষম ত্রাস লইয়া আসিয়া ত্রিপুরার এই অংশে তোমরা নিজেদের ঠাঁই রচিয়াছিলে। এখন দেখা যাইতেছে যে, মিজোরা সমগ্র লুসাই অঞ্চল নিয়া যে অশান্তির আগুন জ্বালিয়াছে, তাহার তাপ হইতে তোমরা হয়ত রেহাই পাইবে না। তোমাদের মনে নিশ্চিন্ততার এই অভাব ঘটায় তোমাদের ঘর-গৃহস্থী, শিল্প-বাণিজ্য সব কিছু ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে। লামডিং ও ডিফুতে যাহারা নাগাদের বোমায় উড়িয়া গেল, তাহাদের দেহাবশেষগুলি তোমরা প্রত্যক্ষ সাক্ষীরূপে দেখিয়াছ এবং তোমাদের দেহেরও যে সেই অবস্থা হইতে হইতে হইল না, তাহা ভাবিয়া বারংবার কম্পিতকলেবরে পরমেশ্বরকে ধন্যবাদ জানাইতেছ। তোমাদের মনের এই অবস্থায় আমার উচিত নহে তোমাদিগকে কোনও বিষয়ে উপদেশ দেওয়া। কিছু দিন যাউক, তোমাদের মনের নিদারুণ চঞ্চলতার কিছুটা উপশম হউক, তারপর তোমরা স্থির করিও যে, দশধা-অঞ্চলেই

তোমরা রহিয়া যাইবে, না, অন্য অঞ্চলে সরিয়া আসিবে। কেন্দ্র যখন দুর্ব্বল হয়, সাম্রাজ্যে তখন প্রান্তে প্রান্তে বিদ্রোহ দেখা দেয়। নাগা-সমস্যা, মিজো-সমস্যা ঐতিহাসিক এই সাধারণ নিয়মেরই দৃষ্টান্ত কিনা, ভবিষ্যতে তাহা দেখা যাইবে। শিশু নাগাদের ও শিশু মিজোদের শরীরের বলসঞ্চার হইতেছে কি না, ইহা পর্য্যবেক্ষণ করিবার জন্য যদি কেন্দ্রীয় ভিষকেরা কৌতূহলী উদাসীন নীতি অবলম্বন করিয়া থাকেন, তাহা হইলে ভাবী ইতিহাস অন্যরূপ কথা বলিবে। আমরা আদার ব্যাপারী, জাহাজের খবর নিবার প্রয়োজন দেখি না। মিজোরা যে রিয়াংদের উপরেও অত্যাচার করিতেছে, একথা তোমরা বিগত আঠারো বছর ধরিয়া দেখিতেছ। এই রিয়াংরা যদি তোমাদিগকে প্রেমের বাহুবন্ধনে ধরিয়া থাকে, তবে একলা তাহাদিগকে মিজো বিদ্রোহের তাপে দগ্ধ হইয়া মরিবার জন্য ফেলিয়া রাখিয়া যাইতে পার না। স্থানত্যাগ একটা অতীব গুরুতর পরিকল্পনা, যাহা মৃত্যুর পরোয়ানা স্বচক্ষে দেখার আগে অবলম্বন করা উচিত নহে। তোমরা দলবদ্ধ ভাবে সরিয়া পড়িলে তোমাদের রিয়াং, কাইফেং, মলসুং, রূপিণী ও চাকমা ভাইবোনদের গতি কি হইবে? শুধু নিজেদের নিয়া ভাবিও না, ইহাদের সকলেরে নিয়া ভাবিতে হইবে। নয়া দিল্লীর কর্ত্তব্য তোমাদের বিপদে আসিয়া রক্ষা করা, কারণ, তোমরা নয়া দিল্লীর প্রতি অনুগত, কিন্তু কোনও কারণে দিল্লী তাহার কর্ত্তব্য না করিতে পারিলেও তোমাদের কর্ত্তব্য তোমাদের করিতেই হইবে। অপমৃত্যুর যেখানে সম্ভাবনা, সেখানে প্রাণপণে বাঁচিয়া থাকিবার চেষ্টা করার চেয়ে বড় কর্ত্তব্য আর কিছুই নাই। সে কর্ত্তব্য তোমাদের পালন করিতেই হইবে।

চলিয়া যদি যাও, কোথায় যাইবে? আসামে? সেখানে কম

বাঙ্গালী যায় নাই। এই সেই দিন মারও খাইল দারুণ। তাহাদের কয়েক হাজার জলপাইগুড়ি আর পূর্ণিয়ার মারেঙ্গা শিবিরে কাল কাটাইতেছে। আবার যদি দলে দলে আসাম যাও, আবার যদি বাঙ্গালী-বিরোধী আন্দোলন সুরু হয়, তখন কি করিবে? বাঙ্গালী হইয়া এক অপরাধ করিয়াছ, কাপুরুষ হইয়া আবার আর একটী অপরাধ করিবে। পত্রিকা পড়িতে পড়িতে কাল ৪ঠা বৈশাখের কাগজে দেখিলাম, এক পত্র লেখক লিখিয়াছেন,—

"বাংলার বাইরে ইদানীং নাকি কলকাতা-বিদ্বেষ বড়ই প্রবল। সি-এম-পি-ও-র সমীক্ষায় প্রকাশিত এই খবর পড়ে মোটেই বিস্মিত হইনি; ব্যক্তি-মানসের মতোই আঞ্চলিক মানসেও হীনম্মন্যতা অজ্ঞাত ব্যাধি নয়, বিশেষ বিশেষ অঞ্চল অন্যদের পরিপ্রেক্ষিতে নিজেদের দেখতে গিয়ে অনায়াসেই তার কবলে পড়তে পারে। সুতরাং এ-ক্ষেত্রে আমাদের পক্ষে সহনশীল হওয়া হয়ত সঙ্গত। কিন্তু তবুও এবার প্রতিবাদ না জানিয়ে পারা যাচ্ছে না। কেননা শুধু হীন কলকাতা-বিদ্বেষেই ওঁরা ক্ষান্ত হননি,—সেই হীনতাকে ঢাকতে গিয়ে তথাকথিত যুক্তিরও অবতারণা করা হয়েছে। সি-এম-পি-ও-র বিবরণ অনুযায়ী ওদের এই কলকাতা-বিদ্বেষের অন্যতম কারণ, কলকাতা বিদেশী শাসনের মজবুত ঘাটি ছিল—স্ট্রংহোলড অব ফরেন রুল। এই উক্তির অর্থ কী? ইংরেজ-সংসর্গের দায় কি একা কলকাতার?

"ইতিহাস আপত্তি করবে। এদেশের ইতিহাস সম্পর্কে যাঁদের সামান্য ধারণা আছে, তাঁরাই জানেন—কলকাতা ভারতের প্রথম আংরেজি শহর নয়। বণিক বেশে বিদেশী ইংরেজ প্রথম যেখানে স্বদেশী বণিক এবং সামান্তদের খাতির লাভ করেছিল, সে হচ্ছে ভারতের পশ্চিম উপকূল। সে সপ্তদশ শতকের প্রথম দিককার কথা।

তৎকালে ভারতে ইংরেজের অন্যতম ঘাটি ত্রিবাঙ্কুরের আঞ্জেনাগো। তারপর ক্রমে বঙ্গোপসাগরের তীরে। বঙ্গোপসাগর; তবে এবারও কিন্তু মাটিটুকু বাংলার নয়। ইংরেজ প্রথম আসন-পিঁড়ি হয়ে বসে মসলিপত্তনে (১৬১১)। এদেশের মাটিতে প্রথম ব্রিটিশ দুর্গ আরমাগাঁওয়ে (১৬২৫)। দুইটি জায়গার কোনটিই বাংলায় নয়। এই আরমাগাঁওয়ের গভর্ণর জনৈক ফ্র্যানসিস ডে-র চেষ্টায় এবং স্থানীয় ব্যবসায়ী শাসকদের সহযোগিতায়ই ১৬৪০ সালে পত্তন হয় ফোর্ট সেন্ট জর্জ্জ তথা মাদ্রাজ শহরের ঘাটি। বোম্বাই অবয়ব লাভ করে ১৬৬১ সনে। আর কলকাতা? তিন প্রেসিডেনসির মধ্যে কলকাতার প্রতিষ্ঠা সকলের পরে। লালদিঘির-তীরে ফোর্ট উইলিয়ামের ভিত্তি-প্রস্তর স্থাপিত হয় ১৬৯৬ সনে। তারপরও কি বলা চলে ইংরেজ-অভিষেকের পাপে কলকাতা একক? যদি কেউ মনে করেন, পলাশীর ফলেই বণিকের মানদণ্ড ক্রমে রাজদণ্ডে পরিণত হয়েছিল, এবং সেদিক থেকে কোম্পানির রাজধানী কলকাতা সেদিন সব পরিণতির জন্য দায়ী, তবে এবারও ভুল হবে। ভারতে ইংরেজ অধিকার সংহত করার ব্যাপারে বোম্বাই এবং মাদ্রাজের ভূমিকাও কম নয়। ক্লাইভ মাদ্রাজ থেকেই কলকাতা উদ্ধারে ছুটে এসেছিলেন।—নয় কি?

"সুতরাং কলকাতা-বিদ্বেষ প্রচারের হাতিয়ার হিসাবে ইতিহাস-বর্ণন যে ছলনা মাত্র, সে বিষয়ে আর কিছু বলা নিষ্প্রয়োজন। যদি ধরেও নিন, ইংরেজ আমলে কলকাতা বিদেশী শাসনের 'স্ট্রংহোল্ড' বা শক্ত ঘাটি, তাহলে সঙ্গে সঙ্গে এটাও স্বীকার করে নিতে হবে যে, সমগ্র ভারতের হয়ে সে-পাপের, চুপে-চুপে গঙ্গোদকে অভিষেক করে দেবার পাপের, প্রায়শ্চিত্তও করেছে এই কলকাতাই। কে না জানে, ভারতের জাতীয়তার পাঠশালা এই শহর? জমিদার-সভা, হিন্দু মেলা,

ব্রিটিশ ইন্‌ডিয়া সোসাইটি, বঙ্গ-ভঙ্গ আন্দোলন, রাখী-বন্ধন—ইত্যাদি সহস্র ঘটনায় কলকাতা সেদিন ভারতের হৃদয়-মণি। 'বাংলা আজ যা ভাবে ভারত তা ভাবে আগামীকাল'—কলকাতা গোখেলের বর্ণিত সেই বাংলারই রাজধানী। এই রাজধানীর নামে তামাম ভারতের জাতীয় নেতৃত্বের নিত্য অভিনন্দন। এমন কী, এই সেদিনও জওহরলালের আত্ম-চরিতে কলকাতা উল্লেখিত হয়েছে কম-পক্ষে ৩৩টি দফায় এবং বলা নিষ্প্রয়োজন, উল্লেখিত হয়েছে ইংরেজের ঘাটি হিসাবে নয়,—ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে ভারতের সবচেয়ে মজবুত, সবচেয়ে বেপরোয়া, সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য, সবচেয়ে প্রাণবন্ত মহানগরী হিসাবে।"

কলিকাতা-৩৭ এর শ্রীঅমলেন্দু চৌধুরী এই লেখাটুকু আনন্দবাজার পত্রিকায় লিখিয়াছেন। কলিকাতার আসল অপরাধ কি? না, আজ সে বাংলা দেশের রাজধানী এবং একদা ছিল সমগ্র ভারতের রাজধানী। নতুবা কলিকাতা নিয়া মিথ্যা যুক্তি সৃষ্টির চেষ্টা বাংলার বাহিরে হইত না। সেই বাংলা দেশের ছেলেমেয়ে তোমরা, তোমরা ভারতের কোন স্থানে গিয়া পুনরায় পলাইতে হইবে না বলিয়া আশা করিবে?

সুতরাং "যেখানেই যাই, পলাইব না,"—এই মনোবৃত্তির অনুশীলন তোমাদের উচিত। "যে অবস্থায়ই পড়ি, প্রয়োজন পড়িলে যুদ্ধ করিয়াই বাস করিব",—এই জিদই তোমাদের আসা উচিত। "কোনও কারণেই অবাঙ্গালীদের সহিত অমৈত্রী, অপ্রীতি, ভেদভাব ও বিরুদ্ধতার সৃষ্টি করিব না",—এই সঙ্কল্পটিকে মনে সুদৃঢ় রূপে স্থাপন করিয়া তারপরে প্রাণপণে বাঁচিবার চেষ্টা করিতে হইবে। যাহারা ইহুদীদের মত সারা ভারতের ধন লুণ্ঠন করিয়া দেশের সব লোককে অন্নে মারার ফন্দী করিয়াছে, চোখের সামনে থাকিলেও লোকে তাহাদিগকে দেখিতে

পাইতেছে না, চিনিতে পারিতেছে না। কিন্তু একদিন বাঙ্গালী সারা ভারতের নেতৃত্ব করিয়াছিল, এই আক্রোশে নির্ব্বিচারে এক শ্রেণীর লোক "বাঙ্গালীকে হটাও" মটো ধরিয়াছে। এসকল গ্রাহ্য করিলে তোমাদের চলিবে না। ভারতে বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, অরবিন্দ একটা করিয়াই জন্মিয়া ছিলেন এবং তাঁহারা বিশ্বের সকলকে আপন ভাবিতে শিখাইয়া ছিলেন। তাঁহারা বাঙ্গালীর ঘরেই জন্মিয়াছিলেন কিন্তু সমগ্র জগতের গুরুস্থানীয় হইয়াছেন। এই সকল সুমহান পুরুষের সাধনার ঐতিহ্যকে তোমরা কদাচ ভুলিও না। ক্ষুদ্র একজন স্বরূপানন্দ বাঙ্গালীর ঘরে জন্মিয়া বাঙ্গালী-অবাঙ্গালী-নির্ব্বিশেষে ভারতের তথা জগতের সকল জাতিতে সকল ধর্ম্মে সকল সমাজে অখণ্ডত্ব-বোধ জাগাইবার সাধনায় বুকের পাঁজরে আগুন ধরাইয়া অগ্রসর হইতেছেন। এসকল কথা তোমরা ভুলিও না। বাঙ্গালী রূপে নহে, মানুষ রূপে তোমাদের বাঁচিয়া থাকিতে হইবে কিন্তু বাঙ্গালীর ঘরে জন্মিয়াছ, এই কল্পিত অপরাধে কেহ তোমাদের মৃত্যুদণ্ড বিধান করিতে চাহিলে তাহার হাত হইতে দণ্ড কাড়িয়া নিবার যোগ্যতাও তোমাদের অর্জ্জন করিতে হইবে।

সেই যোগ্যতা তোমাদের আসিবে প্রেমের অনুশীলনের মধ্যে দিয়া। সেই প্রেমের তোমরা অনুশীলন কর, যেই প্রেমের কথা আমি বহুবর্ষ পূর্ব্বে অখণ্ড-সঙ্গীতটীর মধ্য দিয়া বলিয়াছি।

আমি গাহিয়াছি,—

"খণ্ড আজিকে হোক্ অখণ্ড,
অণু-পরমাণু মিলিত হোক্,
ব্যথিত পতিত দুঃখী-দীনেরা
ভুলুক বেদনা, ভুলুক শোক।।"

বাঙ্গালী যায় নাই। এই সেই দিন মারও খাইল দারুণ। তাহাদের কয়েক হাজার জলপাইগুড়ি আর পূর্ণিয়ার মারেঙ্গা শিবিরে কাল কাটাইতেছে। আবার যদি দলে দলে আসাম যাও, আবার যদি বাঙ্গালী-বিরোধী আন্দোলন সুরু হয়, তখন কি করিবে? বাঙ্গালী হইয়া এক অপরাধ করিয়াছ, কাপুরুষ হইয়া আবার আর একটী অপরাধ করিবে। পত্রিকা পড়িতে পড়িতে কাল ৪ঠা বৈশাখের কাগজে দেখিলাম, এক পত্র লেখক লিখিয়াছেন,—

"বাংলার বাইরে ইদানীং নাকি কলকাতা-বিদ্বেষ বড়ই প্রবল। সি-এম-পি-ও-র সমীক্ষায় প্রকাশিত এই খবর পড়ে মোটেই বিস্মিত হইনি; ব্যক্তি-মানসের মতোই আঞ্চলিক মানসেও হীনম্মন্যতা অজ্ঞাত ব্যাধি নয়, বিশেষ বিশেষ অঞ্চল অন্যদের পরিপ্রেক্ষিতে নিজেদের দেখতে গিয়ে অনায়াসেই তার কবলে পড়তে পারে। সুতরাং এ-ক্ষেত্রে আমাদের পক্ষে সহনশীল হওয়া হয়ত সঙ্গত। কিন্তু তবুও এবার প্রতিবাদ না জানিয়ে পারা যাচ্ছে না। কেননা শুধু হীন কলকাতা-বিদ্বেষেই ওঁরা ক্ষান্ত হননি,—সেই হীনতাকে ঢাকতে গিয়ে তথাকথিত যুক্তিরও অবতারণা করা হয়েছে। সি-এম-পি-ও-র বিবরণ অনুযায়ী ওদের এই কলকাতা-বিদ্বেষের অন্যতম কারণ, কলকাতা বিদেশী শাসনের মজবুত ঘাঁটি ছিল—স্ট্রংহোলড অব ফরেন রুল। এই উক্তির অর্থ কী? ইংরেজ-সংসর্গের দায় কি একা কলকাতার?

"ইতিহাস আপত্তি করবে। এদেশের ইতিহাস সম্পর্কে যাঁদের সামান্য ধারণা আছে, তাঁরাই জানেন—কলকাতা ভারতের প্রথম আংরেজি শহর নয়। বণিক বেশে বিদেশী ইংরেজ প্রথম যেখানে স্বদেশী বণিক এবং সামান্তদের খাতির লাভ করেছিল, সে হচ্ছে ভারতের পশ্চিম উপকূল। সে সপ্তদশ শতকের প্রথম দিককার কথা।

গান মানুষকে মানুষ বলিয়া স্বীকার করিয়াছে, এক মানুষের দুঃখবিদূরণের জন্য অন্য মানুষের আত্মোৎসর্গকে ঋণশোধের পর্য্যায়ে নিয়া ফেলিয়াছে, জগতের প্রতিটি জীবের সহিত অন্য সকলের আত্মীয়তার সম্বন্ধকে স্বীকার করিয়াছে, যে গানের ভাব সহজ, ভাবা সরল, যাহাতে কষ্ট কল্পনা নাই, যাহাতে কৃত্রিমতা নাই। সেদিন হোজাইতে সম্মেলন-মঞ্চে বক্তৃতা দিতে দিতে হইলাকান্দির শান্তিভূষণ ভাবের আবেগে বলিয়া ফেলিয়াছিল, স্বাধীন ভারতের জাতীয় সঙ্গীত হইবার ইহাই উপযুক্ত গান। সে মিথ্যা বলে নাই, ইহা রেজিষ্টার্ড জাতীয় সঙ্গীত না হইলেও আনরেজিষ্টার্ড জাতীয় সঙ্গীত রূপে সর্ব্বত্র সমাদৃত।

এই সেই দিন, ১৪ই বৈশাখ, বৃহস্পতিবার আমি ও সাধনা মাল নামিয়াছিলাম। একটী ভাষণ দিতে হইল। দৈবক্রমে জনৈক গায়ক এই অখণ্ড-সঙ্গীতটীকেই উদ্বোধনী গীতি রূপে গাহিলেন। সঙ্গে সঙ্গে আমরা সকলে দাঁড়াইলাম। বক্তৃতাকালে আমাকে বলিতে হইল, কেন দাঁড়াইয়াছিলাম। ভারতের লোকসভা যাহাকে জাতীয় সঙ্গীত রূপে মর্য্যাদা দিয়াছে, তাহার অন্যতম "জনগণমন" গানটীর উপলক্ষিত "ভারত-ভাগ্যবিধাতা" পুরুষটী কে? এই প্রশ্ন আজ অনেকের মনকে পীড়িত করিতেছে। তিনি কি ঈশ্বর? সেকিউলার ষ্টেটে ঈশ্বরের বন্দনা কেন হইবে? তিনি কি নেতা বিশেষ, যিনি যে-কোনও প্রকারে তক্তে বসিয়াছেন? কিন্তু ব্যক্তিপূজা ত' গণতন্ত্রের অনুমোদিত বস্তু নহে। তবে কেন "জনগণমন" ভারতের জাতীয় সঙ্গীত হইল? বন্দে-মাতরম্, গানকে কোণ-ঠাসা করিবার জন্যই কি? কিন্তু "বন্দে-মাতরম্" গানের ফাঁসীরমঞ্চে জীবনের জয়গান গাহিয়া যাওয়ার ঐতিহ্য আছে,

"জনগণমনের" তাহা নাই। তবে কেন ইহা জাতীয় সঙ্গীত হইল? এই প্রশ্ন গণতান্ত্রিক মনগুলিকে বারংবার পীড়া দিতেছে কিন্তু আমাদের আনরেজিষ্টার্ড জাতীয় সঙ্গীত 'অখণ্ড সঙ্গীত' সম্পর্কে এই সকল প্রশ্নের অবকাশ নাই। ভারতীয় জাতির যাহা কাম্য, এই সঙ্গীতে সহজ ভাবায় তাহার পূর্ণ প্রতিফলন রহিয়াছে। জগদ্বাসী মাত্রেই যাহা বাঞ্ছনীয়, অখণ্ড-সঙ্গীত তাহারই উদ্দীপনা দিতেছে। ইংরাজ যখন ভারত ছাড়ে নাই, দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে দেশপ্রেমিকদিগকে জেলে পুরিতেছে, তখনও আমরা এই অখণ্ড-সঙ্গীত গাহিবার সময়ে সকলে সসম্ভ্রমে দাঁড়াইতাম। তাই দৈবাৎ, আমাদের অজানিতে, এই গানটী মালের সভায় গীত হইতেছে শুনিয়া আর আসনে বসিয়া নির্ব্বিকার শ্রোতার অভিনয় করিতে পারি নাই। আমরা জীবে জীবে প্রেমবন্ধন দেখিতে চাই। আমরা ছোটবড়র ভেদাভেদ ভুলিতে চাই। আমরা ব্যথিত, পতিত, দুঃখী ও দীনের বেদনা ও শোক দূর করিতে চাই। আমরা দূরে সরিয়া থাকিয়া দুর্ভাগ্যহত নরনারীদের দুঃখের পসরার বৃহদায়তন দেখিয়া কেলী-কৌতূক করিতে চাহি না, বরঞ্চ জন্মে জন্মে আত্মবলি দিয়া সকলের সকল অজ্ঞানতাজনিত দুঃখ নাশ করিতে চাই। আত্মকলহ-জনিত কৃত্রিম সহস্র দুঃখ বিদূরণ করিয়া দিয়া আমরা জীবনে অমৃতত্বের আস্বাদন করিতে চাই, সকলকে আস্বাদন করাইতে চাই। আমাদের মূল মন্ত্র ত্যাগ। নিজেকে নিঃশেষে উজাড় করিয়া হৃৎপিণ্ডের শোণিতে জগদ্বাসীর তর্পণ করিতে চাহি,—ভোগান্ধতার মাদকতায় আমরা নিজেদিগকে ঐশ্বর্য্যের হৈমশিখরে ঠেলিয়া তুলিতে চাহি না।

ইহাই অখণ্ড-সঙ্গীতের মর্ম্মকথা। এই জন্যই এই সঙ্গীত গাহিবার কালে চিরকাল আমরা সসম্ভ্রমে দণ্ডায়মান হইয়া এই সঙ্গীতের

তাৎপর্য্যের প্রতি শ্রদ্ধা জানাইব। স্বাধীন ভারত, পরাধীন ভারত, সুখী ভারত, দুঃখী ভারত, সেই সকল বিচার আমরা করিব না, এই সঙ্গীত ভারতের চিরন্তনী গাথা হইয়া থাকিবে।

এই কথা মনে রাখিয়া নিজ নিজ জীবনে এই সঙ্গীতটীকে মূর্ত্তিমন্ত করিয়া তুলিবার সঙ্কল্পে সমারূঢ় হও তোমরা,—তোমাদের জগদ্ব্যাপী ছড়াইয়া পড়িবার ভিতরে বিধাতার বিশেষ ইঙ্গিত আছে। পরমেশ্বরের সেই অঙ্গুলীহেলনের অর্থ বুঝিতে তোমরা ভুল করিও না। প্রেমিক হও এবং প্রবল হও, সাধক হও এবং সবল হও। তোমাদের প্রতিজনের জন্য ইহাই আমার বাণী। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৫১)

হরি-ওঁ

শিলিগুড়ি

১৭ বৈশাখ, ১৩৭৩

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

অনেক কাল ধরিয়া চেষ্টা করিয়াও যাহাদিগকে এত দিনের মধ্যে আমাদের আদর্শের প্রতি অনুরক্ত করিতে পার নাই, আমাদের জগন্মঙ্গল সাধনার প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ করিতে পার নাই, তাহাদিগের সম্পর্কে হাল ছাড়িয়া দিবার মত মানসিক দুর্ব্বলতা যেন তোমার কদাচ না থাকে। ইহারা এতদিনেও আকৃষ্ট হয় নাই বলিয়াই প্রাণ-বিনিময়ে হইলেও ইহাদিগকে কাছে টানিয়া আনিতে হইবে। দূরে একজনকেও

থাকিতে দিবে না, একজনের কাছ হইতেও তোমরা দূরে থাকিবে না। তবে, যাহারা নির্দ্দিষ্ট কোনও একটা পন্থের প্রতি সুগভীর ভাবে আকৃষ্ট বা কোনও সৎ মার্গের পথিক, তাহাদিগের নিষ্ঠা ভাঙ্গিয়া ফেলিবার মত কিছু কদাচ করিবে না। যাহারা অসৎ পথে, অসম্পূর্ণ মার্গে, বিপত্তি-সঙ্কুল কুৎসিত রাস্তায় গিয়াছে, তাহাদের সম্পর্কে তোমাদের এই সহনশীলতার কোনও প্রয়োজন নাই। একজন লোক অন্ধকূপে পড়িয়া মরিতে চলিয়াছে দেখিয়াও, তাহার নিষ্ঠা আমার ভাঙ্গা উচিত নহে বলিয়া, তাহাকে সৎ পথে টানিয়া আনিবার জন্য কোনও চেষ্টা করিবে না, ইহা চলিতে পারে না। যাহারা কোনও-না-কোনও সৎ পথের আশ্রয় লইয়াছে, যাহাদের গৃহীত মার্গকে কোনও না কোনও সঙ্গত যুক্তি দ্বারা সৎ মার্গ বলিয়া সিদ্ধান্ত করা চলে, তাহাদের বিষয় নিয়া তোমাদের মাথা-ব্যথা না থাকিলেও চলিবে।

পৃথিবীর কোনও মতই সর্ব্বজনীন সমর্থন পাইবে না, পৃথিবীর কোনও পথেই প্রত্যেকটী মানব পাদচারণা করিবে না। যাহারা কল্পনা করে যে, তাহাদের পথেই জগতের সকলকে টানিয়া আনিতে পারিবে, তাহাদের উৎসাহ ও বিশ্বাস প্রশংসনীয়,—মাত্র এইটুকুই তাহাদের স্বপক্ষে বলা যাইতে পারে। আবার, পৃথিবীর সব মত-প্রচারকেরা চূড়ান্ত ভাবে নিজ নিজ মত প্রচার করিয়া যাইবার পরেও এমন কতকগুলি বেয়াড়া লোক থাকিয়া যাইবেই, যাহারা ইহাদের কাহারও পথের তোয়াক্কা রাখিবে না। সংখ্যায় তাহারা পৃথিবীর সমগ্র জন-সমষ্টির এক তৃতীয়াংশেরও বেশী হইবে। মাত্র সেই কয়টী লোকের ভিতরে যদি নিষ্ঠাপূর্ব্বক তুমি তোমার নিজ আদর্শ প্রচার করিয়া যাইতে পার, তবে তাহাও তোমার পক্ষে কম কৃতিত্বের কাজ হইবে

না। অবশ্য ইহা দ্বারা একথা বলা হইতেছে না যে, যাহারা কোনও মত সহজে বোঝে, সহজে ধরে, সহজে অনুসরণ করে এবং নিবিড় নিষ্ঠায় উহাতে লাগিয়া থাকে, এমন মধুরস্বভাব সহজপ্রকৃতি স্নিগ্ধচরিত নরনরীদের মধ্যে তোমরা কাজ করিবে না। কাজ তোমরা ইহাদের মধ্যেও অতি অবশ্যই করিবে কিন্তু অন্য মতের প্রচারকারীদের প্রতি আক্রোশ, আস্পর্দ্ধা, বিক্ষোভ, বিদ্বেষ এবং অনিষ্টবুদ্ধি পরিহার করিয়া।

পঞ্চাশাধিক বর্ষ ধরিয়া তোমরা ধীরে ধীরে বাড়িয়াছ। কখনো কখনো বাড়ার হার বিস্ময়কর হইয়াছে। কখনো কখনো স্বল্প সময়ে তোমাদের স্বমতাবলম্বী সাধকের সংখ্যা একটা স্বপ্নদৃষ্ট ঘটনার ন্যায় বা পৌরাণিক কাহিনীর ন্যায় অবিশ্বসনীয় ব্যাপকতা পাইয়াছে। ইহা দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে যে, স্বভাবের পথেই তোমাদের বাড়িয়া চলিবার অধিকার জন্মিয়াছে, কৃত্তিম প্রয়াস তোমাদের কদাচ প্রয়োজন হয় নাই। কদাচ তোমরা দল বাড়াইবার চেষ্টা করিতে আদিষ্ট হও নাই বরং প্রতিরুদ্ধই হইয়াছ। আদেশ লঙ্ঘনের ভয়ে তোমরা নিজেরাও গরজ করিয়া দল বাড়াইবার চেষ্টায় নাম নাই। কিন্তু ইহা দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় না যে, তোমরা তোমাদের সমমতাবলম্বী সমসাধকদের সংখ্যা বাড়াইবার চেষ্টা করিলে তাহাতে দোষ হইবে। যাহারা নিজেদের দল বাড়াইবার জন্য মানুষ-বিশেষকে অবতার বলিয়া প্রচার করিয়াছে, যাহারা নিজেদের দল বাড়াইবার জন্য ভীতি প্রদর্শন, চাকুরীর প্রলোভন আদি বহু গর্হিত কার্য্য করিয়াছে, দলবৃদ্ধির সাধনাতেই যাহাদের শ্রেষ্ঠ নিষ্ঠা ও একাগ্র আত্মনিয়োগ, তোমরা কাহাকেও নিজেদের মতে পথে আনয়নের চেষ্টা করিলে তাহারা এখন তোমাদিগকে নিন্দা করিবে, টিট্‌কারি দিবে, এই সকল আশঙ্কাকে আমল দেওয়া মূর্খতা বা মানসিক

দুর্ব্বলতা ছাড়া আর কিছু বলা চলে না। যে মানুষ অন্ধকারে ডুবিয়া আছে, তাহাকে আলোর নিকেতনে টানিয়া আনিবার তোমার শুধু অধিকারই আছে, তাহা নহে, ইহা তোমার পরম কর্ত্তব্যও বটে। তোমাদের যাহা মত, তাহা উপলব্ধির নিকস-পাষাণে যাচাই করা। তোমাদের যাহা পথ, তাহা শুধুমাত্র ব্যক্তিগত মোক্ষের সাধক নহে, নিখিল বিশ্বের মুক্তিমুখগামী। তোমাদের যাহা সাধন, তাহা কৃত্রিমতাবর্জ্জিত, জটিলতাপ্রমুক্ত, স্বাভাবিক ও সরল। তোমাদের যাহা ধর্ম্ম, তাহা যুক্তির উপরে সুপ্রতিষ্ঠিত। যেখানে যে ধর্ম্মমতই উত্তাল তরঙ্গে ধরিত্রী ঢাকিয়া ফেলিবার চেষ্টা করুক না কেন, নির্ভেজাল যুক্তির উপরে এমন সুদৃঢ় প্রতিষ্ঠা তোমাদের মতের ন্যায় সম্ভবত আর কাহারও নাই। অন্ধ কুসংস্কারকে পুঁজি করিয়া তোমাদের মত ও পথ নিজ বিস্তারের মোহানা বাড়াইতে ব্যস্ত নহে। পূজার আস্পদ হইয়াও তোমাদের গুরু লোকের পূজার বেদীতে বসিতে চাহেন না, নিজেকে ব্রহ্মের সহিত সম্পূর্ণ অভেদ জানিয়াও সমবেত উপাসনার কালে তিনি তোমাদের সমসাধক। এমন গুরুর ও পথের সুপ্রচার সাধনে তোমাদের কুণ্ঠা থাকা অনুচিত। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(ত্রয়োবিংশ খণ্ড সমাপ্ত)